মানুষ পিশাচ

হেমেন্দ্রকুমার রায়

মানুষ পিশাচ

হেমেন্দ্রকুমার রায়

eBook Created By: **Sisir Suvro**

প্রচ্ছদ: **শিশির শুভ্র**

Find More Books!

Gooo...

www.shishukishor.org

www.dlobl.org

www.amarboi.com

www.boierhut.com/group

প্রথম পরিচ্ছেদ

জনশূন্য আলিনগর

সন্ধ্যার আগেই আজ পৃথিবী অন্ধকার হবে। পশ্চিমের আকাশে এখনো খানিকটা জায়গা জুড়ে অস্তগত সূর্যের বুকের রক্ত-মাখানো আলো ছড়ানো আছে বটে, কিন্তু তার চিহ্ন তাড়াতাড়ি মুছে ফেলবার জন্যে হু-হু করে বিরাট এক কালো মেঘ ধেয়ে আসছে।

চারিদিকে ছোট-বড় পাহাড় আর বন-জঙ্গল; মাঝখানের উঁচু-নিচু পথ দিয়ে একখানা মোটরগাড়ি ছুটে আসছে উর্ব্বশ্বাসে।

গাড়ির ভিতরে বসে রয়েছে তিনজন যুবক ও একটি ষোলো সতেরো বছরের মেয়ে; যুবকদের পরনে খাকি শার্ট ও প্যান্ট এবং প্রত্যেকেরই হাতে একটি করে বন্দুক।

এ-অঞ্চলের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সেনের পুত্র অমিয় আজ তার তিন অতিথি-বন্ধুর সঙ্গে পাখি শিকারে বেরিয়েছে। তার বোন শীলাও আবদার ধরে তাদের সঙ্গে এসেছে। সারাদিন বনজঙ্গলে ঘুরে এখন তারা বাড়ি ফিরছে।

অমিয়র বন্ধু পরেশ বললে, আমি, গতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না। ঝড় উঠল বলে! কাছে কোথাও লোকালয় নেই?

অমিয় গাড়ি চালাচ্ছিল। সে জবাব না দিয়ে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলে।

নিশীথ বললে, অমি, যতই স্পীড বাড়াও, আজকের এই ঝড়কে তুমি কিছুতেই হারাতে পারবে না। ঐ দেখ, আকাশের শেষ আলোও নিবে গেল।

শীলা আমোদ-ভরে গাড়ির গদির উপর বসে-বসে নেচে উঠে বললে, "ওহো, কী মজা। বন-জঙ্গলের ভিতরে থেকে আমি কখনো ঝড় দেখিনি! ভাগ্যিস আজ দাদার সঙ্গে এসেছি।"

পরেশ ও নিশীথ হাসিমুখে শীলার দিকে তাকালে। বন-জঙ্গলে ঝড় যে কী ভয়ানক, শীলা যদি তা জানত!

অমিয় বললে, পরেশ, আর ঝড়কে এড়াবার চেষ্টা করা মিছে। ঐ দেখ, মাঠের ওপারের গাছপালাগুলো দুলতে শুরু করেছে।

কালো আকাশে বজ্র-বিদ্যুতের অভিনয় আরম্ভ হলো। এবং শূন্যে মেঘপুঞ্জের তলায় দূরে এক তীব্রগতি ধুলোর মেঘ জেগে উঠল। এবং তফাত থেকেই শোনা গেল, বাতাসের মধ্যে ফুটল কেমন এক অশান্ত প্রলাপ।

নিশীথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে বললে, দূরে লোকালয়ের মতো কী দেখা যাচ্ছে না?

অমিয়, এ-অঞ্চলের পথ-ঘাটের খবর রাখত। সে বললে, আমি ঐদিকেই যাচ্ছি। ওখানে আলয় আছে বটে, কিন্তু লোক নেই।

পরেশ বললে, তার মানে?

—ওটা একটা ছোট শহর। অনেক দিন আগে মড়কে ওখানকার বেশির ভাগ লোকই মারা পড়ে—বাকি সবাই পালিয়ে যায়, আর ফিরে আসেনি। ওর নাম আলিনগর। ওখানে এখন জনশূন্য পোড়ো ভাঙা বাড়ি আর ধ্বংস-স্তূপ ছাড়া অন্য কিছুই নেই। তবে, ওরই মধ্যে কোনখানে হয়তো মাথা গুঁজে আজকের মতো ঝড়কে ফাঁকি দিতে পারব।

পরেশ ও নিশীথ খুশি হয়ে বললে, ব্যস, অল রাইট ।

শীলা কিন্তু কেমন যেন কুঁকড়ে পড়ে বললে, ও দাদা, এই অন্ধকারে আলিনগরে গিয়ে কাজ নেই! তার চেয়ে মাঠে ঝড়ের ধাক্কা খাওয়া ঢের ভালো!

অমিয় বিস্মিত স্বরে বললে, কোন রে শীলা, আলিনগরে যেতে তোর আপত্তি কিসের?

শীলা বললে, আমাদের বাবুর্চির মুখে শুনেছি, আলিনগরে এখন যারা থাকে, তারা মানুষ নয়!

—মানুষ নয়? তুই কি বাঘ, ভালুক, হায়েনার কথা বলছিস?

—না দাদা, না। তারা নাকি মানুষের মতো দেখতে, কিন্তু তারা মানুষ নয়! শুনেছি, তারা দিনে কবরে গিয়ে ঘুমোয়, রাত্রে বেরিয়ে এসে দেখা দেয়া!

তিন বন্ধুতে একসঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠল। এই একেলে মানুষগুলোর কানে সেকেলে ভূতের কথা ঠাট্টা-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। আজগুবি ভূতের গল্প শুনে বড়-জোর সকৌতুকে সময় কাটানো চলে, কিন্তু তা বিশ্বাস করবে খালি খোকা-খুকী আর মুর্খরা। অতএব অমিয় বললে, তুই কি ভূতের কথা বলছিস? ছিঃ শীলা, এখনো তোর ও-সব কুসংস্কার আছে?

কিন্তু শীলা কোন জবাব দেওয়ার আগেই ঝোড়ো হাওয়া পাগলের মতো। হুঙ্কার দিয়ে তাদের উপরে লাফিয়ে পড়ল। প্রথম আক্রমণেই সে নিশীথের মাথা থেকে টুপি এবং শীলার হাত থেকে রুমাল কেড়ে নিয়ে ধূলায় ধূলায় চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে দিলে। অন্ধকার আকাশে বাজ চ্যাঁচাতে লাগল। গলা ফাটিয়ে এবং এখানে ওখানে মড়মড় করে দু-তিনটে গাছ ভেঙে পড়ল। এক মুহূর্তেই পৃথিবীর রূপ গেল বদলে।

তীক্ষ্ণ ধূলাবৃষ্টির মধ্যে অনেক কষ্টে তাকিয়ে অমিয় 'হেড-লাইট' জ্বেলে দেখলে, খানিক তফাতেই ভাঙা মসজিদের মতো একখানা সাদা বাড়ি দেখা যাচ্ছে।

তীরের মতো গাড়ি ছুটিয়ে সেইখানে গিয়ে থেমে পড়ে অমিয় বললে, পরেশ, নিশীথ! শীলাকে নিয়ে শীগগির নেমে পড়ো! ঐ মসজিদে গিয়ে ঢোকো!

মসজিদের এক দিক ভেঙে পড়েছে, কিন্তু আর একটা অংশ তখনো কোনগতিকে দাঁড়িয়ে আছে। সকলে তাড়াতাড়ি সেই অংশে গিয়েই আশ্রয় নিলে।

বাইরে তখন যে কাণ্ড হচ্ছে ভাষায় তা বুঝানো যায় না। কষ্টিপাথরের মতো কালো নিরেট অন্ধকারে পৃথিবীকে কানা করে ক্ষ্যাপা ঝড় আজ যেন বিশ্ব লুণ্ঠন করতে চায়। দিকে দিকে বিদ্যুতের শত শত অগ্নি-সর্প লেলিয়ে দিয়ে ব্রজভেরীতে মৃত্যু-রাগ পূর্ণ করে এবং অরণ্যের যন্ত্রণা-ভরা ছটফটানি শুনে বিপুল অট্টহাসি হেসে প্রলয়-আনন্দে ঝঞ্ঝার তাণ্ডব চলতে লাগল।

পরেশ সভয়ে বললে, আমি, এ ভাঙা মসজিদ থর-থর করে কাঁপছে! মাথার উপরে ভেঙে পড়বে না তো?

শীলাকে নিজের আরো কাছে টেনে এনে অমিয়া নাচারভাবে বললে, ভেঙে পড়লেই উপায় কী?

শীলা কাতরভাবে বললে, ও দাদা, চল, আমরা বাইরে পালিয়ে যাই।

—পাগল! বাইরে গেলে ঝড়ে উড়ে যাবি!

প্রায় আধাঘন্টা পরে ঝড়ের বেগ কিছু কমে এল বটে, কিন্তু ঝম-ঝম-ঝম-ঝম করে বিষম বৃষ্টি শুরু হলো। মসজিদের একটা দরজা-জানলারও পাল্লা ছিল না, বেগবান হাওয়ায় হু-হু করে ভিতরেও জল ঢুকতে লাগল।

নিশীথ বললে, অমি, গাড়ি থেকে টর্চটা এনেছো?

—এনেছি। কেন?

—একবার জ্বেলে দেখো তো কোনোদিকে শুকনো ঠাঁই আছে নাকি? অন্ধকারে আমার পা বাড়াতে ভয় হচ্ছে, যদি সাপ-টাপ কিছু থাকে!

টার্চটা জ্বেলে একদিকে আলোর রেখা ফেলতেই অমিয় চমকে উঠলো এবং সঙ্গে সঙ্গে শীলা প্রায় কান্নার স্বরে বলে উঠলো, ও কে দাদা, ও কে?

প্রকাণ্ড ঘরের আধখানা ছাদ ভেঙে পড়েছে, এবং মেঝের উপরে স্তূপের মতো জমে রয়েছে ভাঙা টালি, ইট, বালি-সুরকির চাঙড়, কড়ি ও বরগা প্রভৃতি। তারই ভিতরে স্থিরভাবে দুই হাঁটুর উপরে মুখ রেখে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে অদ্ভুত এক মানুষের মূর্তি।

দীর্ঘ, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেহ, লম্বা লম্বা চুল মাথা থেকে কাঁধ পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে, গোঁফদাড়ি কামানো, পরনে একটা কালো ওভারকোট ও ঢিলে ইজের। কিন্তু তার চোখ দু-টো! মোটরের হেডলাইটের মতো সেই চোখ তীব্র দীপ্তিতে এমন উজ্জ্বল যে, তাদের দিকে তাকাতেও কষ্ট হয়। তার কালো পোশাক আর কালো মুখ কালো অন্ধকারে মিশিয়ে প্রায় অস্পষ্ট হয়ে আছে, কিন্তু, অস্বাভাবিকভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠে চোখ দুটো অপার্থিব বিভীষিকা সৃষ্টি করেছে। দেখলেই বুকের কাছটা ধড়ফড় করতে থাকে।

অমিয় অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, কে তুমি?

গভীর স্বরে মূর্তি বললো, পথিক।

—তোমার নাম কী?

“আমি পথিক, এই পরিচয়ই যথেষ্ট।

— এখানে কেন?

—যেজন্যে তোমরা এখানে এসেছ, আমিও সেইজন্যেই এখানে।

—এতক্ষণ সাড়া দাওনি কেন?

—দরকার হয়নি বলে দিইনি।

অমিয় টর্চ নিবিয়ে ফেললো, চারিদিকে আবার অন্ধকার নেমে এলো। কিন্তু সকলের মনে হতে লাগলো, সেই অন্ধকারের ভিতর হতে অপরিচিত মূর্তি যেন থেকে থেকে আগুনের ফিনকি ছড়িয়ে দিচ্ছে।

অমিয়কে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে শীলা ভয়ার্ত স্বরে চুপিচুপি বললে, দাদা, শীগগির এখান থেকে বেরিয়ে চলো, নইলে আমি হয়তো অজ্ঞান হয়ে যাবো!

পরেশ ও নিশীথও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলো। এতক্ষণ পরে পরেশ বললে, আমি, এখানে দাঁড়িয়েও যখন ভিজতে হচ্ছে, তখন গাড়িতে গিয়ে বসাই ভালো।

বাইরে তখনও আঁধার রাত্রির বুকে মাথা ঠুকে ঝড় চ্যাঁচাচ্ছে গোঁ-গোঁ-গোঁ-গোঁ, গাছেরা পরস্পরের গায়ে আছড়ে পড়ে কেঁদে ককিয়ে বলছে সর্-সর্-সর্-সর্ এবং শূন্যের অসীম সাগর উছলে জলের ধারা ঝরছে রম-ঝম, রম-ঝম।

অমিয় কান পেতে শুনে বুঝলে, পাহাড়ে পথের উপর দিয়েও কল-কল করে জলস্রোত ছুটছে। এ-পথে মোটর চালানো এখন মোটেই নিরাপদ নয় বটে, কিন্তু এই ভাঙা মসজিদের ফুটো ছাদের তলায় অন্ধকারে এই বিচিত্র মূর্তির সঙ্গে এখানে থাকতে তারও আর ইচ্ছা হলো না। সে শীলার হাত চেপে ধরে বললে, চলো, আমরা গাড়িতে গিয়ে বসি।

অন্ধকারে ভিতরে একটা অস্ফুট শব্দ হলো-কে যেন চাপা গলায় হাসলে।

অমিয়ার ভয়ানক রাগ হলো;—তারা ভয় পেয়ে পালাচ্ছে ভেবে ঐ লোকটা কি ঠাট্টার হাসি হাসছে? কিন্তু শীলার কথা ভেবে রাগ সামলে সে একেবারে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো।

শীলা বললে, তখুনি বলেছিলুম দাদা, এখানে এসো না!

অমিয় জোর করে হেসে বললে, আরো গেলো, তুই কি ভেবেছিস লোকটা ভূত?

শীলা বললে, ও ভূত কিনা জানিনা, কিন্তু ওকে দেখে আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছিলো!

—তোর সবতাতেই বাড়াবাড়ি! নে, এখন গাড়িতে উঠে বোস!

গাড়ির উপরে উঠে ধুপ করে বসে পড়ে শীলা বললে, শীগগির স্টার্ট দাও দাদা, এখানে আর আধ মিনিটও নয়।

পরেশ ও নিশীথ গাড়ির উপরে গিয়ে বসলো। অমিয় স্টার্ট দিয়ে গাড়িতে উঠলো।

কিন্তু পথ তখন ছোটখাটো নদীতে পরিণত হয়েছে—প্রায় হাঁটুভোর জল সশব্দে ছুটে চলেছে। এ-পথে কেমন করে গাড়ি চালাবে তাই ভাবতে ভাবতে অমিয় হেড-লাইট-টা জ্বেলে দিলে।

কিন্তু ওরা আবার কে? হেড-লাইট-এর জোর আলো সুমুখের পথে পড়তেই দেখা গেলো, ছয়জন লোক পাশাপাশি গাড়ির দিকেই পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে।

পরিত্যক্ত আলিনগর, দিনের বেলাতেই সেখানে মানুষের দেখা মেলে না, কিন্তু আজ সন্ধ্যার পর ঘুটফুটে অন্ধকারে, জলে-ঝড়ে-দুর্যোগে, ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কারা এরা? এই কি পথে বেড়াবার সময়?

শীলা, পরেশ ও নিশীথ তাদের দিকে হতভম্বর মতো তাকিয়ে রইলো।

পাশের জঙ্গল থেকে কতকগুলি শেয়াল সমস্বরে কেঁদে উঠলো। যেন তারা এদের চেনে, যেন তারা এদের ভয় করে, যেন তারা পৃথিবীর জীবদের সাবধান করে দিচ্ছে!

অমিয় ঘন-ঘন মোটরের হর্ন বাজাতে লাগলো।

কিন্তু তারা যেন শুনতে পেলেনা,—তালে তালে যেন মেপে মেপে পা ফেলে তারা সমানে এগিয়ে আসছে—যেন সব দম-দেওয়া কলের মূর্তি। প্রত্যেকের পরনে সাদা কাপড়, প্রত্যেকের দেহের উপর দিকটা আড়ষ্ট এবং প্রত্যেকের হাত দুটো পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর হাতের মতো দু-পাশের স্থিরভাবে ঝুলছে,—চলছে। কেবল তাদের পাগুলো—

সেই জলে-ঝড়ে অমিয়ার দেহ ঘেমে উঠলো; চেঁচিয়ে বললে, কে তোমরা? আমার হর্ন শুনতে পাচ্ছে না? সরে যাও-নইলে মরবে!

তারা কেউ সাড়া দিলে না, পথ জুড়ে তালে তালে গাড়ির দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। যেন তারা থামতে জানে না, কার অভিশাপ যেন তাদের কিছুতেই থামতে দেয় না, যন্ত্রচালিতের মতো তাদের যেন চলতেই হবে সারা পৃথিবীর মাটি মাড়িয়ে অনন্ত—অনন্তকাল ধরে!

অমিয় বললে, ডাকাত নয় তো? পরেশ! নিশীথ! বন্দুক নাও।

সকলে আপনি-আপনি বন্দুক তুলে নিলে। তবু যারা আসছে তারা থামলো না, ভয়ও পেলো না।

অমিয় চেঁচিয়ে বললে, আর এক-পা এগুলেই গুলি করবো।

ধূপ-ধূপ-ধূপ-ধুপ করে পায়ের শব্দ তুলে মূর্তিগুলো আরো কাছে এসে পড়লো।

অমিয় মহা ফাঁপরে পড়ে ভাবতে লাগলো।—কারা এরা? ডাকাত, না পাগল? না। এরা ভাবছে যে বন্দুক ছুঁড়বো বলে আমরা ঠাট্টা করছি? কিন্তু আর তো ওদের কাছে আসতে দেওয়া উচিত নয়, গাড়িতে শীলা রয়েছে, কোনো বিপদ হলে বাড়িতে গিয়ে মুখ দেখাবো কেমন করে? যা হয় হোক, আমার কথা না শুনলে এবার আমি বন্দুক ছুঁড়বোই!

সে আবার শুষ্ক স্বরে চেঁচিয়ে বললে, এই শেষবার বলছি, পথ ছেড়ে দাও!

তারা সমানে এগিয়ে আসছে, আসছে, আর আসছেই। 'হেডলাইট'-এর তীব্র আলোকে তাদের রুক্ষ চুল ও বিস্ফারিত স্থির চোখের পাতা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ছয়জোড়া নিস্পলক চোখের পূর্ণদৃষ্টি অমিয়দের দিকে স্থির হয়ে আছে—প্রত্যেক চোখ যেন মড়ার চোখ!

তিনজনেই বন্দুক তুলে লক্ষ্য স্থির করলো। মূর্তিগুলো যখন গাড়ির কাছ থেকে দশ-বারো হাত তফাতে এসে পড়েছে অমিয় তখন বললে, আমি তিন গুনলেই তোমরা বন্দুক ছুঁড়ো!

তবু তারা থামলো না।

—এক!

—দুই!

—তিন!

গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম! তিনজনেই বুঝলে, তাদের লক্ষ্য ভুল হয়নি—এত কাছ থেকে ভুল হতেই পারে না, কিন্তু তবু সেই মূর্তিগুলো তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে—আরও এগিয়ে—আরও এগিয়ে আসতে লাগলো।

এ-কী অসম্ভব ব্যাপার!

আচম্বিতে ভাঙা মসজিদের ভিতর থেকে হা-হা-হা-হা-করে কে বন্য পশুর কণ্ঠে মানুষের স্বরে ভয়াবহ অট্টহাসি হাসতে লাগলো।

শীলা আর্তনাদ করে অজ্ঞান হয়ে গদির উপরে লুটিয়ে পড়লো।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মারা মানুষের জ্যান্ত চোখ

—"দিনে দিনে হলো কী? দুনিয়ার বড়ো বড়ো সাধুর অভাব হয়েছে অনেক দিনই। আজকাল আবার বড়ো অসাধুরও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। পুলিশ কোর্টের রিপোর্টে দেখছি খালি কতকগুলো গাঁটকাটা আর ছিচকে-চোরের ইতিহাস। দূত্তোর খবরের নিকুচি করেছে!"—এই বলে জয়ন্ত খবরের কাগজখানা সজোরে মাটির উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

মানিক কফি তৈরী করতে করতে বললে, শহরে বড়ো বড়ো চোর-ডাকাত-খুনে নেই, এটা তো পুলিশের কৃতিত্বের পরিচয়। এ-জন্যে আমাদের সুন্দরবাবুও অনায়াসে বাহাদুরির দাবি করতে পারেন।

—কিন্তু চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাপি না থাকলে পুলিশেরও চাকরি থাকবে না, আর আমাদেরও সময় কাটবে না।

মানিক কফির পেয়ালা জয়ন্তের সামনে এগিয়ে দিলে।

পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে জয়ন্ত বললে, কেবল তাই নয়। অপরাধীর অভাবে কোনোকোনো দেশে পুলিশের অত্যন্ত দুর্দশাও হয়। ইউরোপের একটা শহরে চোরেরা একবার ধর্মঘট করেছিল তা জানো?

মানিক আশ্চর্য হয়ে বললে, কি রকম? চোরদের ধর্মঘট? এ যে গৃহস্থের পক্ষে মত বড়ো সুখবর!

—হাঁ, গৃহস্থের পক্ষে। কিন্তু যে শহরের কথা বলছি, সেখানকার পুলিশ এটা সুখবর বলে মনে করেনি। শহরবাসীরা হঠাৎ একদিন সকালে উঠে দেখলে, রাস্তায় রাস্তায় দেওয়ালের গায়ে এই বিজ্ঞাপন; চুরি-ব্যবসায় অচল হইয়া পড়িয়াছে। পুলিশ এতো বেশি ঘুষ দাবি করে যে, চোরাই মাল বেচিয়া আমাদের আর কোনো লাভ থাকে না। পুলিশের এই অন্যায় দাবির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য এই নগরের চোর-সম্প্রদায় অদ্য হইতে চৌর্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিল।

—তারপর।

তারপর আর কী। দু-চারদিন পরেই সেখানকার পুলিশ মানতে বাধ্য হলো যে, অতঃপর চোরদের কাছ থেকে আর অতো বেশি ঘুষ দাবি করবে না। তখন চোরেরা আবার ধর্মঘট বন্ধ করলো।

এমন সময় পায়ের শব্দে বাড়ি কাঁপিয়ে এবং সুবিপুল ভূঁড়ি দুলিয়ে ইনস্পেক্টর সুন্দরবাবু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন। এদিকে-ওদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, এই যে, চা খাওয়া হয়ে গেছে দেখছি!

জয়ন্ত বললে, না, আমরা এইমাত্র কফি শেষ করলুম।

সুন্দরবাবু বললেন, হুম! কফি? এই গরমে? ওরে ব্যাপারে, তোমাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। একশো টাকা বখশিশ দিলেও আমি এখন এক কাপ কফি খাবো না।

জয়ন্ত বললে, একশো টাকা বা কফির কাপ কিছুই আপনার ভাগ্যে নেই। আপনার জন্যে এখনি এক পেয়ালা চা আসবে।

—আর টোস্ট, ডিম, জ্যাম?

—তাও আসবে। আপনি নির্ভয়ে চেয়ারে বসে পড়ুন।

ইতিমধ্যে মানিক খবরের কাগজখানা কখন মাটি থেকে তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। সে বললে, জয়, তুমি কি আজকের কাগজখানা ভালো করে পড়েনি?

—না, পুলিশ-কোর্টের কলম ছাড়া আর কিছু আমি দেখিনি।

—"চট্টগ্রাম থেকে এদের নিজস্ব সংবাদদাতা কী লিখেছে জানো?

—না।

—শোনো তা হলে, বলে মানিক পড়তে আরম্ভ করলে

'বিভীষণ বিভীষিকা!

রহস্যময় মেয়ে-চুরি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের চতুর্দিকস্থ গ্রামে গ্রামে ভীষণ বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছে। মাসাধিক কালের মধ্যে এখানে তিন-তিনটি পরিবারের তিনটি মেয়েকে কে বা কাহারা চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে।

আসল ব্যাপার কিছুই বুঝা যাইতেছে না। এমন অদ্ভুত কাণ্ড এ-অঞ্চলে আর কখনও হয় নাই। পুলিশ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে বটে, কিন্তু যে-তিমিরে সেই তিমিরেই পড়িয়া আছে।

প্রথম ঘটনাটি এইঃ বীরনগর গ্রামের মধুসূদন কর্মকারের বড়ো মেয়ে প্রমদা সন্ধ্যার সময়ে গ্রামের প্রান্তে পুষ্করিণীতে গিয়াছিল। কিন্তু সে আর ফিরিয়া আসে নাই। প্রথমে সবাই ভাবিয়াছিল, সে জলে ডুবিয়া গিয়াছে। কিন্তু পুষ্করিণীর

তলা পর্যন্ত তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও তাহার দেহ পাওয়া যায় নাই। প্রমদার বয়স পনেরো বৎসর মাত্র। সবে গত মাসে তাহার বিবাহ হইয়াছে।

দ্বিতীয় ঘটনার বিবরণঃ বীরনগর হইতে দশ মাইল তফাতে চণ্ডীপুর। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চৌধুরী এখানকার একজন বিশিষ্ট গৃহস্থ। তাহার দৌহিত্রীর নাম কুমারী কমলা দেবী, বয়স যোলো বৎসর। এক রাত্রে গুমোট গরমে ঘুম হইতেছিল না দেখিয়া কমলা বাহিরের বারান্দায় আসিয়া শয়ন করে। শেষ রাত্রে হঠাৎ কমলার ভীত চিৎকারে বাড়ির আর সকলের ঘুম ভাঙিয়া যায়। কমলার পিতা ও পঞ্চাননবাবু প্রভৃতি বারান্দায় ছুটিয়া আসেন। কিন্তু কমলা তখন অদৃশ্য হইয়াছে।

পুলিশের তদন্তে আর একটি অদ্ভুত বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে। বাড়ির সকলে যখন কমলার জন্য খোঁজাখুঁজি ও ছুটাছুটি করিতেছিলেন, তখন গ্রামের পথ হইতে কে নাকি ভয়াবহ অট্টহাস্য করিয়া উঠিয়াছিল। সেদিন অমাবস্যার রাত্রি ছিল, সকলে অন্ধকার পথে ছুটিয়া যায়; কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পায় নাই। কেবল এক আশ্চর্য শব্দ শোনা যায়। অনেকগুলি লোক যেন একসঙ্গে সৈন্যদলের মতো সমতলে সশব্দে পা ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছে।

তৃতীয় ঘটনা ঘটিয়াছে মাত্র দুই দিন আগে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মি. আর. এন. সেনের একমাত্র কন্যা কুমারী শলি তাঁহার ভ্রাতা মি. অমিয় সেনের সঙ্গে শিকার দেখিতে গিয়াছিলেন। পোড়ো শহর আলিনগরের কাছে কাহারা নাকি আক্রমণ করিয়া কুমারী শীলাকে লইয়া পলাইয়া গিয়াছে। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এখনো প্রকাশ পায় নাই, যথাসময়ে আমরা সব কথা জানাইব।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, একালে ইংরেজ রাজত্বের কোন জায়গায় উপরি-উপরি এমন তিনতিনটি ঘটনা ঘটা সম্ভব কি না? যদি সম্ভবপর বলিয়া স্বীকার করিতেই হয়, তবে অনর্থক এই বিপুল পুলিশ-বাহিনী পুষিয়া লাভ কী? যেখানে ম্যাজিস্ট্রেটের কন্যা পর্যন্ত চুরি যায়, সেখানে সাধারণ দরিদ্র প্রজারা কাহার মুখ চাহিয়া বাস করিবে? আমরা পুলিশের এই অকর্মণ্যতার দিকে গভর্নমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।"

ইনস্পেক্টর সুন্দরবাবু শুনতে শুনতে মুখগহ্বরে আধখানা 'টোস্ট' নিক্ষেপ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনে তাঁর আর টোস্ট খাওয়া হলো না, তিনি চটেমটে বলে উঠলেন, হুম। যতো দোষ নন্দ ঘোষা! যেখানে যা-কিছু দুর্ঘটনা ঘটবে তার জন্যে দায়ী হচ্ছিআমরাই।

জয়ন্ত জবাব দিলে না, নীরবে নস্যদানি বার করে একটিপ নস্য নিলে।

সুন্দরবাবু বললেন, সব ব্যাপারগুলোই আজগুবি! চোরেরা যে চুরি করতে এসে অট্টহাঁসি হাসে আর গোরাদের মতো তালে তালে পা ফেলে চলে, এটা এই প্রথম শুনলাম। তারা তো উদয়শঙ্করের মতো তালে তালে নাচতে নাচতে পালালেও পালাতে পারতো।

বেয়ারা ঘরে ঢুকে বললে, একজন সায়েববাবু ডাকছেন।

জয়ন্ত বললে, এখানে নিয়ে এসো।

সুন্দরবাবু বললেন, সায়েকবাবু আবার কী জীব?

—আমাদের বেয়ারা বিলাতি পোশাকে বাঙালীকে ঐ নামে ডাকে।

ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়ালো একটি তরুণ যুবক। তার পরনের বিলাতি পোশাক ইস্ত্রিহীন, এলোমেলো, মাথায় টুপি নেই—ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, চক্ষের দৃষ্টি উদভ্রান্ত। দেখলেই মনে হয় সে যেন অত্যন্ত চিন্তিত ও বিপদগ্রস্ত।

জয়ন্ত শুধালে, আপনি কাকে চান?

—জয়ন্তবাবুকে। আমি ভয়ানক বিপদে পড়ে ছুটে এসেছি

—আমারই নাম জয়ন্ত। আপনার নাম জানতে পারি কি?

—আমার নাম অমিয় সেন, আমি চট্টগ্রাম থেকে আসছি।

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললে, বসুন। খবরের কাগজে বোধহয় এইমাত্র আপনারই নাম দেখেছি। আপনি তো চট্টগ্রামের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মি. আর. এন. সেনের পুত্র?

অমিয় চেয়ারে বসে পড়ে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। ব্যাপারটা যখন আগেই শুনেছেন তখন আমি কেন যে এখানে এসেছি, সেটাও বোধহয় বুঝতে পেরেছেন?

—আপনার ভগ্নীকে আপনি উদ্ধার করতে চান?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, শীলাকে উদ্ধার না করে বাবার কাছে আর মুখ দেখাবো না।

তাহলে আগে সমস্ত ঘটনা আমাদের কাছে খুলে বলুন।

অমিয় খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর ধীরে ধীরে বললে, কিন্তু সব শুনে আপনি হয়তো পাগল বা মিথ্যাবাদী বলে মনে করবেন।

—কেন?

—সমস্ত ঘটনাটাই এমন অসম্ভব যে আমার বাবাও আমার কথা বিশ্বাস করেননি। অথচ আমার প্রত্যেক কথাই সত্য।

—হোক অসম্ভব, তবু কোনো কথাই আপনি যেন গোপন করবেন না। কিছু লুকোলে আমি আপনার কোনো উপকারেই লাগবো না, এইটুকু খালি দয়া করে মনে রাখবেন।

অমিয় তার কাহিনী বলতে লাগল। সে যা বললে তার অধিকাংশই আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছি-গাড়ির উপরে শীলার মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাওয়া পর্যন্ত। অতএব এখানে অমিয়র কথার শেষ অংশ মাত্র দেওয়া হলোঃ

ওদিকে ভাঙা মসজিদের ভিতর থেকে সেই অমানুষী হাসি, এদিকে বন্দুকের গুলিতে আহত হয়েও নির্বিকারের মতো সেই ছয়টা আড়ষ্ট দেহ একেবারে আমাদের গাড়ির কাছে এসে পড়েছে। আমার পাশেই শীলার মূর্ছিত দেহ পড়ে রয়েছে, চারিদিকে ঝোড়ো হাওয়ার প্রচণ্ড নিশ্বাস, বৃষ্টির ঝরঝর কান্না, মাথার উপরে আকাশ ঘন-ঘন জ্বলিছে বিদ্যুৎ-চকমকির ফিনকি। আমি যেন কেমন আচ্ছন্নের মতো হয়ে গেলুম এবং সেই অবস্থাতেই বুঝতে পারলুম, পরেশ ও নিশীথও গাড়ির ভিতরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

গাড়ির সামনে এসে মূর্তিগুলো থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। সেই সময়ে তাদের চোখগুলো দেখে আমার বুক শিউরে উঠলো। মরা মানুষ তাকিয়ে দেখলে বোধ করি তাদের দৃষ্টিও এইরকম দেখতে হয়! সে চোখগুলো যেন তাকিয়ে আছে মাত্র, কিন্তু তাদের ভিতরে কোনো ভাবেরই আভাস নেই এবং তারা চোখ খুলে তাকিয়েও যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না!

মূর্তিগুলো হঠাৎ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলো। তিনজন এলো গাড়ির বাঁ পাশে, আর তিনজন এলো ডান পাশে। সঙ্গে সঙ্গে 'হেড-লাইটে'র আলোক-রেখা ছাড়িয়ে তাদের দেহগুলো ঘুটফুটে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো।

তারপর আমি কী করবো না-করবো ভাবতে-না-ভাবতেই আচম্বিতে দু-খানা বিষম কঠিন হাত আমার কোমর জড়িয়ে ধরলে। সে হাত-দু-খানা কেবল কঠিন নয়, কী অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা! আমি প্রাণপণে বাধা দিয়েও তাদের ঠেকাতে পারলুম না, হাত-দুখানা আমাকে এক টানে শূন্যে তুলে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে,—মাটিতে পড়ে মাথায় চোট লেগে আমিও তখনই অজ্ঞান হয়ে গেলুম এবং অজ্ঞান হয়ে যেতে যেতে আবার শুনতে পেলুম সেই অমানুষী হা-হা-হা-হা হাসি।

যখন জ্ঞান হলো তখন মেঘলা আকাশে ঝাপসা ভোরের আলো ফুটে ওঠবার চেষ্টা করছে।

গাড়ির হুডের উপরে মাথা রেখে পরেশ ও নিশীথ অভিভূতের মতো পড়ে রয়েছে।

আমি পাগলের মতো গাড়ির কাছে ছুটে গিয়ে ডাকলুম, শীলা! শীলা!। পরেশ ক্ষীণ স্বরে বললে, শীলা নেই!

আমার কথা আর বেশি বাড়াবো না। কেবল এইটুকুই জেনে রাখুন, প্রায় বৈকাল পর্যন্ত আমরা তিনজনে আলিনগরের সমস্তটা তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখলুম। কিন্তু পেলুম খালি পোড়ো বাড়ির পর পোড়ো বাড়ি, ধ্বংসস্তুপের পর ধ্বংসস্তুপ—সেখানে কোথায় শীলা, কোথায় সেই ছয়টা অদ্ভুত মূর্তি, আর কোথায় ভাঙা-মসজিদে-দেখা সেই ঘোর কালো লম্বা লোকটা! কারুর কোনো চিহ্ন নেই।

কি-রকম মন নিয়ে বাড়িতে ফিরে এলুম, আর সমস্ত শুনে মা ও বাবার অবস্থাই বা হলো কী রকম, এখানে সে-সব কথা বলবার দরকার নেই।

নিশীথ আপনার শক্তির কথা জানে। সেই-ই আমাকে পরামর্শ দিলে আপনার কাছে আসতে। তখন আহত দেহে চট্টগ্রাম থেকে আপনার কাছে চলে এসেছি। জয়ন্তবাবু, এখন আপনার সাহায্যই আমার শেষ ভরসা।

অমিয় স্তব্ধ হলো, জয়ন্ত গভীর মুখে বারবার নস্য নিতে লাগলো।

মানিক খবরের কাগজখানা নিয়ে আর একবার পড়তে বসলো।

খানিক পরে এই নীরবতা সইতে না পেরে সুন্দরবাবু বলে উঠলেন, হুম! মি. সেন, আপনি যা বললেন তার কিনারা করা জয়ন্ত বা পুলিশের কাজ নয়!

অমিয় করুণ স্বরে বললে, তবে আমার কী হবে?

—যা শুনলুম তা যদি পাগলের প্রলাপ না হয়, তাহলে রীতিমতো ভৌতিক ব্যাপার বলেই মানতে হয়। জয়ন্ত কি পুলিশ, ভূত ধরতে পারবে না, আপনি কোনো ভালো রোজার খোঁজ করুন। আপনার বোনকে ভূতে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে।

জয়ন্ত আর-একটিপ নস্য নিয়ে বললে, মানিক, জিনিস-পত্তর সব গুছিয়ে নাও অমিয়বাবুর সঙ্গে আজই আমরা চট্টগ্রাম যাত্রা করবো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পদচিহ্ন ও গোরস্থান

জনশূন্য আলিনগর। চারিধারে ছোট ছোট পাহাড়ের ঢেউ-খেলানো প্রাচীর, বাতাসের ছোঁয়ায় ঐকতান-বাজানো বনভূমির শ্যামলিমা, মাঠে মাঠে জলের আলপনা আঁকতে আঁকতে নদীর রূপালী খেলা, কোথাও ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যায় বনমুরগিরা, কোথাও হঠাৎ শিস দিয়ে ওঠে অজানা গানের পাখি, কোথাও অনেক দূর থেকে শোনা যায়। কার বাঁশির হারিয়ে-যাওয়া সুর। এরই মধ্যে ঘুমিয়ে নিঃসাড় হয়ে আছে। জনশূন্য আলিনগর। পাহাড়ের উপর থেকে তাকে দেখায় একখানি ছবির মতো।

বাড়ির পর বাড়ি—কোনো-কোনো বাড়ির বয়সও বেশি নয়, আকারও জীর্ণ নয়। মাঝে মাঝে এক-একখানা বাগান-বাড়িও চোখে পড়ে—এখনো দু-চারটে কঠিনপ্রাণ ফুল গাছ অযত্নেও বেঁচে থেকে রঙ ফুটিয়ে আগেকার গৌরবের পরিচয় দেবার ক্ষীণ চেষ্টা করছে।

কিন্তু অধিকাংশ বাড়িই নীরবে যেন প্রচার করতে চায় ধ্বংস-দেবতার মহিমা। তাদের দেখলেই মনে পড়ে খণ্ড-বিখণ্ড মাংসহীন কঙ্কালকে। স্থানে স্থানে ধ্বংসস্তূপের জন্যে চলবার পথ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। এ-যেন কোনো অভিশপ্ত পৃথিবীর এক অংশ—মৃত মানুষের স্মৃতি আছে, কিন্তু জ্যান্ত মানুষের দেখা নেই। মাঝে মাঝে এক-একটা মসজিদ, কিন্তু তাদের ছায়ায় আজ আর কেউ উপাসনা

করতে আসে না। থেকে থেকে এক একটা ঘুঘুর বিষাদমাখা সুর যেন মৌন বিজনতার দীর্ঘশ্বাসের মতো জেগে উঠেই স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে।

জয়ন্ত সারাদিন ধরে আজ আলিনগরের জনশূন্যতার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং তার সঙ্গে আছে মানিক, অমিয়, পরেশ, নিশীথ ও সুন্দরবাবু।

জয়ন্তের সঙ্গে ইনস্পেক্টর সুন্দরবাবুর এখানে আসবার কোনোই দরকার ছিলো না, কিন্তু খানিকটা কৌতুহলে পড়ে ও খানিকটা এই নুতন দেশে বেড়াবার ঝোকে সুন্দরবাবুও কিছুদিনের ছুটি নিয়ে জয়ন্ত ও মানিকের সঙ্গী হয়েছেন।

সারাদিন কোথাও উল্লেখযোগ্য কিছুই আবিষ্কার করা গেলো না। বৈকালে তারা শহরের প্রান্তে একটা ছোট নদীর ধারে এসে দাঁড়ালো।

সুন্দরবাবু সারাদিনই কাঠ-ফাটা রোদে আমন টো-টো করে ঘুরে বেড়ানোর বিরুদ্ধে কঠিন কঠিন মত প্রকাশ করে আসছিলেন, কিন্তু এবারে তিনি রীতিমতো বিদ্রোহ প্রকাশ করে বললেন, হুম! আমি বাবা আর এক পা নড়ছি না! তোমাদের খাতিরে পড়ে শেষটা কি আত্মহত্যা করব? এখানে সর্দি-গমি হলে দেখবে কে?

জয়ন্ত একবার সুন্দরবাবুর দিকে ফিরে তাকালো। মরুভূমিতে দরিয়ার মতো তার বিপুল টাকের উপর দিয়ে দর-দর ঘামের ধারা নেমে আসছে এবং পথশ্রমে তীর বিরাট ভুঁড়ি হাপরের মতো একবার ফুলে উঠছে ও একবার চুপসে যাচ্ছে দেখে তার দয়া হলো। বললে, আচছা সুন্দরবাবু, এইবারে আমরা খানিকটা বিশ্রাম করতে পারি। আমাদের শহর দেখা শেষ হয়েছে।

সুন্দরবাবু উচ্চৈঃস্বরে একটি সুদীর্ঘ "আঃ" উচ্চারণ করে নদী-তীরের বালির উপরে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়লেন।

অমিয় বললে, তাহলে এর পরে আমরা কী করবো?

জয়ন্ত বললে, আজকের রাতটা আমরা এখানেই কাটিয়ে দেবো।

সুন্দরবাবু ভয়ানক চমকে উঠে বললেন, অ্যাঁ, সে কী কথা? থাকবো বললেই তো থাকা হয় না, এখানে থাকবে কোথায়?

জয়ন্ত বললে, যদিও আজ চাঁদ উঠবে না, তবু মাথার উপর আকাশের চাঁদোয়া আছে তো!

—যদি বৃষ্টি আসে?

—এখানে মাথা গুজবার জন্যে পোড়ো বাড়ির অভাব নেই। গোটা শহরটাই তো আজ আমাদের দখলে।

সুন্দরবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, আ-হা-হা-হা, মরে যাই আর কি! সব ব্যবস্থাই তো করে দিলে দেখছি! কিন্তু পোড়ো বাড়িতে পোড়া পেটের অন্ন জোটাবে কে?

—অন্ন আজ জুটবে না।"

—হুম! মাফ কর ভাই, আমি বিধবা স্ত্রীলোক নই, উপোস্য-টুপোস আমার ধাতে সহ্য হয় না!

—তাহলে আপনি বাসায় ফিরে যান!"

—একলা?

—কাজেই।

—'হুম!' সুন্দরবাবু একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন,—সূর্য ডুবু ডুবু। সন্ধ্যা আসি-আসি করছে। রাত-আঁধারে এখানে কী সব কাণ্ড হয়। অমিয়র মুখে তা শুনতে বাকি নেই। একলা এখান থেকে ফেরা অসম্ভব, কারণ সুন্দরবাবু ভূত-

পেত্নী মানেন। এবং অমিয়র বোন শীলাকে যে মানুষ চুরি করেছে, এ-কথাও তিনি বিশ্বাস করেন না। একলা বাসায় ফেরবার সময়ে যদি তাদের কারুর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়...সুন্দরবাবু অত্যন্ত অসময়ে এখন বুঝতে পারলেন যে, এই সব নির্বোধ, গোয়ার ছোকরার দলে ভিড়ে তিনিও বুদ্ধিমানের কাজ করেন নি।

জয়ন্ত তাঁর মনের ভাব আন্দাজ করে মৃদু হেসে বললে, ভয় নেই সুন্দরবাবু, আজ রাত্রে অন্ন না জুটলেও অন্য কিছু জুটতে পারে।...নিশীথবাবু, বলুন তো, আপনাদের গাড়িতে রসদ কী আছে?

নিশীথ বললে, এক কাঁদি মর্তমান কলা, ল্যাংড়া আম, সন্দেশ, ছয় ডজন চিকেন স্যাণ্ডউইচ, কিছু কেক, আর কিছু বিস্কুট।

জয়ন্ত বললে, অতএব সুন্দরবাবু আজ উপোস করবার ভয় নেই।

সুন্দরবাবু অল্প একটু হেসে বললেন, তাহলে তোমরা এখানে রাত্রিবাস করবার। জন্যে তৈরি হয়েই এসেছ?

—কতকটা তাই বটে।

—এটা আগে আমাকে জানালেই পারতে! এখানে রাত কাটাবার প্রস্তাব আমার ভালো লাগছে না!

এমন সময়ে মানিক বললে, অমিয়বাবু, আপনি না বলেছিলেন, মানুষ এখানে আসতে চায় না?

—হ্যাঁ! এ-জায়গাটার বদনাম আছে। আর সে বদনাম যে মিছে নয়, তারও প্রমাণ আমরা পেয়েছি!

—তাহলে বালির উপরে এই পায়ের দাগগুলো কিসের?—বলে মানিক নদীর তীরে অঙ্গুলি-নির্দেশ করলে।

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল।

বালুতটে লম্বা পায়ের দাগের সারি,—নদীর জলের দিক থেকে উপর দিকে উঠে এসেছে। আর সবগুলিই হচ্ছে মানুষের পায়ের দাগ।

জয়ন্ত বললে, সুন্দরবাবু, আপনি পায়ের দাগ পরীক্ষা করতে জানেন?

—পুলিশে কাজ করি, তা আর জানি না?

—আমেরিকার "রেড-ইণ্ডিয়ান'-রা পুলিশে কাজ করে না, কিন্তু পায়ের দাগ দেখে অপরাধী ধরতে তারা যেমন ওস্তাদ, পৃথিবীর কোনো বড় ডিটেকটিভও তেমন নয়। কিন্তু সেকথা এখন থাক। আমাদের সামনের এই দাগগুলো দেখে অনেক কথাই বলা যায়।

—হুম! কী বলা যায় শুনি?

জয়ন্ত পকেট থেকে গজকাঠি বার করে একমনে দাগগুলো মাপতে লাগল। তারপর বললে, দাগগুলো যখন এত স্পষ্ট তখন নিশ্চয় পুরানো নয়। হয়ত কালই দাগগুলোর উৎপত্তি হয়েছে। এখান দিয়ে একদল লোক গিয়েছে। যে দলের একজন লোক খুব বেশি ঢ্যাঙা! বেঁটেদের চেয়ে লম্বা লোকদের পায়ের দাগের মধ্যে ব্যবধান হয় বেশি। দলের একজন লোক খুব মোটা, তাই তার পায়ের দাগ বালির ভিতরে বেশি গভীর হয়ে বসেছে। দলের একজনের ডান-পা খোঁড়া—বলির উপরে তার ডান পায়ের আঙুলের চিহ্ন রয়েছে, কিন্তু গোড়ালির চিহ্ন নেই।

এখানে ছয়জন লোকের পায়ের দাগ আছে। আমি ছয়জোড়া আলাদা পায়ের দাগ পেয়েছি। অমিয়বাবু, আপনাদের যারা আক্রমণ করেছিল—

বিবর্ণ মুখে অমিয় বলে উঠল, তাদের দলেও ছয়জন লোক ছিল।

জয়ন্ত খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, এ-গুলো তাদেরই পায়ের দাগ হলে বলতে হয়, তাদের ভূত-প্রেত বলে সন্দেহ করবার কোনো কারণ নেই। তারা ছায়ামূর্তি হলে এখানে তাদের পায়ের দাগ পড়ত না।

পরেশ বললে, তারা ভূত-প্রেত কি না জানি না, কিন্তু আমাদের বন্দুকের গুলি খেয়েও তারা যে এগিয়ে এসেছিল, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মানিক বললে, কিন্তু তখন আপনাদের মাথার ঠিক ছিল? নিশ্চয়ই আপনাদের গুলিতে তারা আহত হয়নি?

নিশীথ বললে, "আমাদের পক্ষে জোর করে কিছু বলা সাজে না, আর অসম্ভবে কেউ বিশ্বাস করবেই বা কেন? কিন্তু জানবেন, তারা আমাদের এত কাছে ছিল যে অতি-বড় আনাড়ীর বন্দুকের গুলিও ব্যর্থ হবার কথা নয়।

জয়ন্ত বললে, যাক, এখন আর ও-নিয়ে তর্কের দরকার নেই, কারণ সেই মূর্তি-ছটা সামনে না থাকলে ও-তর্কের কোনো মীমাংসাই হবে না। তার চেয়ে এখন দেখা যাক, ঐ দাগগুলো কোন দিকে গিয়েছে।

সুন্দরবাবু তখন 'রসদ' খানাতল্লাস করবার জন্যে নিশীথদের মোটরের ভিতর প্রবেশ করেছেন।

আগেই বলা হয়েছে পায়ের দাগগুলো উঠে গিয়েছে উপর দিকে। সকলে সেই রেখা ধরে ঢালু জমির উপর দিয়ে অগ্রসর হল। কিন্তু বেশি দূর যেতে হল না। কারণ নদীর প্রায় ধারেই রয়েছে একটা জঙ্গলময় জমি, এক সময়ে তার চারিদিকে যে প্রাচীর ছিল, স্থানে স্থানে তার কিছু কিছু চিহ্ন আজও বর্তমান রয়েছে। পায়ের দাগগুলো সেই জমির ভিতরেই প্রবেশ করেছে।

সকলে ভাঙা প্রাচীরের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। মানিক উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, সারাদিনের পর একটা হদিস মিলল বটে, কিন্তু আজ বোধহয় আর কিছু নতুনত্ব পাওয়া যাবে না। সূর্য ডুবে গিয়েছে।

পশ্চিমের আকাশে তখন সোনালি ও লাল রঙ গুলে কে যেন নূতন ছবি আঁকবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ করবার জন্যে অন্ধকার খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে। ...সুমুখের জমির ঝোপ-ঝাপের আশেপাশে অন্ধকার এখনি ঘন ও রহস্যময় হয়ে উঠেছে, চারিদিক এমন স্তব্ধ যে একটা সূঁচ পড়লেও শোনা যায়। সেই মৌনতার ভিতরে মাথার উপর দিয়ে যখন একঝাঁক বক উড়ে গেল তখন তাদের ডানাগুলোর ঝটপট শব্দ শুনে মনে হল, যেন অনেকগুলো ভৌতিক আত্মা যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

এমন সময় দেখা গেল, সুন্দরবাবু হাঁসফাঁস করতে করতে দৌড়ে আসছেন—তাঁর এক হাতে খান-কয় স্যাণ্ডউইচ এবং অন্য হাতে এক ছড়া কলা-কাছে এসেই তিনি বললেন, এই ভর সন্ধেবেলায়, এই মারাত্মক জায়গায় আমাকে একলা ফেলে তোমরা কোথায় পালিয়ে যেতে চাও?

মানিক বললে, সে কি সুন্দরবাবু, অমন ঝুড়ি ভরা আম, কলা, কেক, সন্দেশ, বিস্কুট আর স্যাণ্ডউইচের মাঝখানেও নিজেকে আপনি একলা বলে মনে করছিলেন?

সুন্দরবাবু বললেন, ঠাট্টা আমি পছন্দ করি না! কিন্তু জয়ন্ত তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

—ঐ জমির মধ্যে। পায়ের দাগগুলো ওর মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে।

সুন্দরবাবুদু চারবার উঁকি-ঝুঁকি মেরে বললেন, বাব্বাঃ, ওটা যে গোরস্থান বলে মনে হচ্ছে!

—হ্যাঁ, ওটা গোরস্থানেই বটে। এখনো দু-চারটে কবরের পাথর অটুট আছে। আমি জানতে চাই, পরিত্যক্ত শহরে এই পোড়ো গোরস্থানে ছয় জন মানুষ কী উদ্দেশ্যে এসেছিল? হয়ত তারা এখনো ওর মধ্যেই আছে। কারণ পায়ের দাগ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এ-পথ দিয়ে এখনো তারা বেরিয়ে আসেনি।

—হয়ত তারা অন্য পথ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে।

—হতে পারে। কিংবা এখনো তারা বেরিয়ে যায়নি।

—কিন্তু আর যে আলো নেই!

—আকাশের আলো নেই, আমাদের আলো আছে। সুন্দরবাবু, ভুলে যাচ্ছেন কেন, আমরা ছটা বড়ো বড়ো পেট্রলের লণ্ঠন এনেছি। সেগুলো জ্বালালে এখানটা আলোয় আলো হয়ে উঠবে।

সুন্দরবাবু বললেন, শোন জয়ন্ত, রাত্রিবেলায় বেড়াবার পক্ষে গোরস্থান খুব ভালো জায়গা নয়! আমরা তো কাল সকালেও ওর মধ্যে যেতে পারি।

জয়ন্ত দৃঢ়স্বরে বললে, এক রাত্রের হেরফেরে সমস্ত সুযোগও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আমি আজকেই এই গোরস্থানটা দেখব।

আচম্বিতে খানিক তফাতে হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে একটা অত্যন্ত কঠিন ও নিষ্ঠুর অট্টহাসি জেগে উঠল।

সুন্দরবাবু চমকে একেবারে দলের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন—তাঁর হাত থেকে কলার ছড়া খসে পড়ে গেল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক তখন ঝাপসা, জয়ন্ত কারুকেই দেখতে পেলে না—সে বুকের উপরে দুই হাত রেখে স্তব্ধ ও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সেই আশ্চর্য অট্টহাসি শুনতে লাগল।

অমিয় ম্লান মুখে অস্ফুট স্বরে বললে, সেদিনও আমরা এই অমানুষী হাসিই শুনেছিলুম!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আবার সেই মারাত্মক ছয়

নদীর মতো শব্দেরও স্রোত আছে। নদীর স্রোত দেখা যায়, কিন্তু শব্দের স্রোত ধরা পড়ে কানে। খানিকক্ষণ ধরে সেই ভয়াবহ অট্টহাসির শব্দ ঠিক স্রোতের মতোই শূন্যতার মধ্য দিয়ে অবিরাম বয়ে চলল। তারপর হঠাৎ হাসি থেমে গেল এবং তার প্রতিধ্বনিগুলো ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল যেন নিস্তব্ধতার মহাসাগরে।

সুন্দরবাবু তখন দুই হাতে দুই কান চেপে মাটির উপর উবু হয়ে বসে পড়েছেন। অমিয়, নিশীথ ও পরেশ প্রাণপণে পরস্পরের হাত চেপে ধরে আড়াষ্টের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

জয়ন্ত বললে, যে হাসছে সে হয় পাগল, নয়। আমাদের ঠাট্টা করছে।

মানিক কিছু বললে না, কেবল নিজের বন্দুকের কুঁদোটা মাটির উপরে ঠক-ঠক করে ঠুকতে লাগল।

রাত্রিময়ী বনভূমি, ভয়-ভরা রহস্যময় তার রূপ। মাথার উপরে অন্ধকারে আকাশদানবের হাজার হাজার তারকা-চক্ষু মিটমিট করে তাকিয়ে আছে। তার তলায় আরো ঘন অন্ধকারে পর্বতশিখরগুলো যেন দৈত্যপুরীর বিচিত্র ও বিরাট অভিনয়-ভঙ্গিতে স্থির ও স্তম্ভিত হয়ে আছে এবং তারাও তলায় যেন সীমাহারা বিশাল অরণ্য সভয়ে বদ্ধ স্বরে থেকে থেকে আর্তনাদ করে উঠছে।

ঘুঘুর ম্রিয়মাণাসুরকে ঘুম পাড়িয়ে জেগে উঠছে প্যাঁচার বিরক্ত কর্কশ কণ্ঠ—সে যেন বিপুল বনকে এবং এই বনের ভিতরে আজ যারা এসে পড়েছে তাদের সবাইকে ক্রমাগত অভিশাপের পর অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছে এবং তারই সঙ্গে তাল রেখে ঘন-ঘন বেজে উঠছে কালো বাদুড়দের অলক্ষুণে ডানাগুলো।

সুন্দরবাবু শিউরে শিউরে বলে উঠলেন, আলো জ্বালো, আলো জ্বালো, আলো জ্বালো!

পেট্রলের লণ্ঠন আনবার জন্যে পরেশ গাড়ির দিকে অগ্রসর হল। জয়ন্ত একখানা হাত ধরে তাকে থামিয়ে বললে, কোথায় যাচ্ছেন?

—আর যে অন্ধকার সইতে পারছি না, আলোগুলো এনে জ্বেলে ফেলি!

—না, যদি এখানে সত্যিই শত্রু থাকে, তাহলে আলো জ্বালালে আমাদের দেখতে পাবে। এখন অন্ধকারই আমাদের বন্ধু।

সুন্দর বাবু বসেই পিছন হটতে হটতে বললেন, কিন্তু শত্রুরা অন্ধকারেই আমাদের দেখতে পেয়েছে—ঐ ঝোপের ভিতর থেকে তারা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে!

মানিক দেখলে, সামনের একটা ঝোপ থেকে সত্য সত্যই চার-চারটে চোখের আগুন জ্বলছে আর নিবছে—জ্বলছে আর নিবছে।

অমিয় ও নিশীথ বন্দুক তুললে।

জয়ন্ত হেসে বললে, খুব সম্ভব দুটো শেয়াল আশ্চর্য হয়ে আমাদের দেখছে।

তারপরেই আগুন-চোখগুলো আর দেখা গেল না।

জয়ন্ত বললে, সুন্দরবাবু, মিছে ভয় পেয়ে রজ্জুতে সর্পভ্রম করবেন না। ভয় বড়ো সংক্রামক। একজন ভয় পেলে আর সকলেও ভয় পাবে! অথচ এখানে ভয় পাবার মতো কিছুই আমি দেখছি না।

কিন্তু সুন্দরবাবু জয়ন্তর কথা শুনতে পেলেন বলে মনে হল না—তিনি তখন কান পেতে অন্য কি যেন শুনছিলেন।

মানিক চুপিচুপি বললে, জয়, নদীর জলে ছপ-ছপ শব্দ হচ্ছে। কে যেন নদী পার হচ্ছে!

তারপরেই শব্দটা থেমে গেল। খানিক পরে খুব কাছেই শোনা গেল কার পায়ের শব্দ। কে যেন দ্রুতপদে গোরস্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু সে যে কে, কিছুই নজরে পড়ল না, ছিদ্রহীন অন্ধকার তার মূর্তিকে একেবারে গ্রাস করে ফেলেছে।

পায়ের শব্দও ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল।

অমিয় অস্ফুটস্বরে বললে, জয়ন্তবাবু, যেখানে দিনের বেলায় মানুষ আসতে ভয় পায়, সেখানে এমন সময়ে এই অন্ধকারে যে বেড়াতে আসে, তাকে কি সাধু বলে মনে হয়?

সুন্দরবাবু বললেন, হুম। কিন্তু এখান দিয়ে যে গেল সে কি মানুষ? এই রাত্রে এই পোড়ো শহরের গোরস্থানের সঙ্গে জ্যান্ত মানুষের কী সম্পর্ক থাকতে পারে? আমরা জোখে দেখছি খালি অন্ধকার, ও কিন্তু দিব্যি হন হন করে এগিয়ে গেল!

মানিক বললে, জয়, আমরাও কি ওর পিছনে গোরস্থানে গিয়ে ঢুকব?

জয়ন্ত বললে, গোরস্থানে ঢুকতে হলে আলো-জ্বালতে হয়। কিন্তু এখন আলো জ্বালা আর নিজে-থাকতে ধরা দেওয়া একই কথা। কী যে করব বুঝতে পারছি না।

সুন্দরবাবু বললেন, এখন আমাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে মানে মানে গাড়িতে গিয়ে উঠে পড়া। নইলে ভুত কি মানুষ শত্রুর হাতে না হোক, সাপ কি বিচ্ছুর কামড়ে আমাদের মৃত্যু হবে অনিবার্য।

পরেশ বললে, "এইমাত্র আমার উপর দিয়ে সড়-সড় করে কি চলে গেল!

সুন্দরবাবু আঁৎকে উঠে। লাফাতে লাফাতে ও পা ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, হুম!! আমার পায়ে উঠলে সে নিশ্চয়ই আমাকে কামড়ে দেবে। এই—হুস হুস! এই—হুস হুস!

মানিক হেসে ফেলে বললে, সুন্দরবাবু, হুস-হুস করে আপনি কি কাক তাড়াচ্ছেন?

সুন্দরবাবু চোখ রাঙিয়ে বললেন, মরছি নিজের জ্বালায়, এখন আর ঠাট্টা করে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না মানিক!.ওরে বাস রে, এ কী অন্ধকার!! দুনিয়ায় এত অন্ধকারও থাকতে পারে! অ জয়ন্ত, কোন দিকে গাড়ি আছে বলে দাও! তোমরা না-যাও, আমি একলাই গাড়িতে গিয়ে বসে থাকব!

সুন্দরবাবু পায়ে পায়ে এগিয়ে চললেন, এবং আচম্বিতে বনের ভিতর থেকে জেগে উঠল বাঘের গভীর গর্জন।. তিনি চমকে আবার পায়ে পায়ে পিছিয়ে দলের মাঝখানে এসে হতাশভাবে বললেন, 'তাহলে উনিও এখানে আছেন?' তাড়াতাড়ি পিঠ থেকে বন্দুকটা নামিয়ে তিনি আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হলেন ও সাপের ভয়ে মাঝে মাঝে পা ঝাড়তে লাগলেন।

শৃগালদের সম্মিলিত কোলাহল জানিয়ে দিলে, এখন দুপুর রাত্রি। নদীর কলতান শোনাচ্ছে কান্নার মতো। আকাশ একে অন্ধকার কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল অধিকতর পুরু আর-একটা অন্ধকারের ঘোমটা ছড়িয়ে পড়ে আকাশের তারকা-নেত্রগুলোকে ঢেকে দিচ্ছে।

জয়ন্ত বললে, মেঘ উঠেছে। আজও হয়ত ঝড়-বৃষ্টি হবে।

অমিয় বললে, তাহলে আমাদের দুর্দশার বাকি কিছু আর রইল না। এইবেলা—

কিন্তু তার মুখের কথা মুখেই রইল—সেই আসন্ন দুর্যোগের বিভীষিকা, সেই নিবিড় তিমিরের ভয়াল অন্ধতা, সেই নানা-শব্দ বিচিত্র গভীরতা, সেই পরিত্যক্ত সমাধিক্ষেত্রের অমানুষিকতার ভিতর থেকে জাগ্রত হল ভয়ঙ্কর অস্বাভাবিক এক কণ্ঠধ্বনি। কে যেন আকাশবাতাসকে কাঁপিয়ে কাদের ডেকে ডেকে তীব্রস্বরে বলছে—'ওরে আয়, ওরে আয়, ওরে আয়, আয় তোরা আয় রে! অন্ধকারে যারা দেখতে পায় তারা আসুক এখন অন্ধকারে যারা দেখতে পায় না তাদের কাছে। আকাশের মেঘ তোদের ডাকছে, নিঝুম রাতের আঁধার তোদের ডাকছে, মৃত আত্মার বন্ধু তোদের ডাকছে! কবরে কবরে দুয়ার খুলে যাক, কফিনে কফিনে জীবন জাগুক, মরা চোখে চোখে আলো ফুটুক! বেগম-সাহেবা বসে বসে কাঁদছে, বাদীরা অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছে না, আলো নিয়ে তোরা সবাই আয় আয়-ওরে আয় রে!'

বোঁ-বোঁ-বোঁ-বোঁ করে হঠাৎ একটা পাগলা হাওয়ার ঝাপট বয়ে গেল, কড়া-কড়-কড়-কড় করে বজ্রের ধমক শোনা গেল, মড়-মড়-মড়-মড় করে বড়ো-বড়ো গাছের মাথা মাটির দিকে নুয়ে পড়ল। বাঘ আর ভয়ে গর্জন করছে না,

প্যাঁচা-বাদুড় ভয়ে আর ডানা ঝাঁটপটিয়ে উড়ছে না, শৃগালরা ভয়ে আর আগুন-চোখ মেলে তাকাচ্ছে না।

তারপরেই খল-খল-খল-খল করে আবার সেই অট্টহাসির পর অট্টহাসির স্রোত। অমিয় প্রায় আর্ত স্বরে বলে উঠল, ও হাসি আমি চিনি; কিন্তু অমন করে কথা কইল কে?

সুন্দরবাবু ঠক-ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, কে ডাকছে, কে আসবে, কে অন্ধকারে দেখতে পায়, কে বেগম আর কেই বা বাদী? আমরা কি সশরীরে নরকে এসে পড়েছি?

জয়ন্তও যেন আপন মনেই অস্ফুট স্বরে বললে, বেগমই বা কে, আর বাঁদীই বা কারা? এ কি পাগলের প্রলাপ? মানিক, তোমার কী মত? লণ্ঠনগুলো জ্বেলে আমরা কি গোরস্থানে ঢুকে ঐ পাগলটাকে আক্রমণ করব?

মানিক সজোরে জয়ন্তর কাঁধ চেপে ধরে বললে, চুপ চুপ! ঐ দেখা!

জয়ন্তর দুই চক্ষে অত্যন্ত বিস্ময়ের ভাব জেগে উঠল। তাদের কাছ থেকে প্রায় দুইশত গজ তফাতে, গোরস্থানের ভিতরে নড়ে-নড়ে বেড়াচ্ছে কতকগুলো আলো। তাহলে ঐ গোরস্থান নির্জন নয়? ওখানে আলো নিয়ে কারা কী করছে?

আবার সেই কণ্ঠস্বর—ওরে আয়, ওরে আয়, আয় তোরা আয় রে! রোশনাই কই, খানা কই। বিছানা কই?

আলোগুলো এতক্ষণ এলোমেলো ছিল, হঠাৎ এখন সার-বেঁধে একদিকে এগিয়ে চলল।

সুন্দরবাবু বললেন, হুম! ও হচ্ছে আলেয়ার আলো!

পরেশ বললে, না, ও আলো নয়। যাদের হাতে আলো আছে, তাদেরও আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে।

নিশীথ বললে, কিন্তু ভালো করে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কে ওরা? এই গোরস্থানের ভেতরে কি ডাকাতদের আড্ডা আছে?

জয়ন্ত বললে, অমিয়বাবু, আপনাদের ছয়জন লোকে আক্রমণ করেছিল তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—মানিক, নদীর তীরে আমরাও আজ ছয় জোড়া পদচিহ্ন আবিষ্কার করেছিলাম তো?

—হ্যাঁ।

—এখন ঐ আলোগুলো গুনে দেখ দেখি।

মানিক গুনতে শুনতে বললে—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়। ছটা আলো—তার মানে, ছজন লোক।

অমিয় উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, জয়ন্তবাবু! তাহলে ওরাই আমাদের শীলাকে চুরি করেছে! ওরা ভূতই হোক আর মানুষই হোক, কিছুই আমি কেয়ার করি না—আমি এখনই ওদের আক্রমণ করব-আমার বোনকে উদ্ধার করব।—হয় আমি মরব, নয়। ওদের মারব!

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে চেপে ধীরে বললে, শান্ত হোন অমিয়বাবু, এখন গোয়ার্তুমি করবার সময় নয়! ওখানে যদি ডাকাতের দল থাকে তাহলে ওদের দলে কত লোক আছে তা কে বলতে পারে? আমরা ওখানে গিয়ে প্রাণ দিলে তো আপনার বোনের উপকার হবে না।

মানিক বললে, আলোগুলো আবার কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল!

জয়ন্ত স্থিরভাবে বললে, যাক গে। আমাদের এখানে অপেক্ষা করা সার্থক হয়েছে। কাল সকালে এই গোরস্থানই হবে আমাদের কার্যক্ষেত্র। আজ এই অন্ধকারে অজানা জায়গায় গোলমাল করে কিছুই হয়ত করতে পারব না, মাঝখান থেকে শত্রুরা সাবধান হয়ে সরে পড়বে। বৃষ্টি এল বলে, রাত পোয়াতে আর ঘণ্টা-কয় মাত্র দেরি আছে; বাকি রাতটুকু মোটরে বসে কাটিয়ে দিই গে চল।

অমিয় নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও জয়ন্তর কথামত নিজেদের মোটর গাড়ির দিকে যাবার জন্যে ফিরে দাঁড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে সকলে শুনতে পেল, বনের পথে আবার কার একখানা মোটর গাড়ির গর্জনগাড়িখানা যেন খুব তাড়াতাড়ি ছুটছে!

অমিয় আশ্চর্য হয়ে বললে, এখানকার সবই কি অস্বাভাবিক! এমন জায়গায় এমন সময়ে কে আবার মোটরে চড়ে হাওয়া খেতে এল?

নিশীথ বললে, একখানা নয়, আবার আর-একখানা মোটর! ঐ শোনো, এখানাও খুব জোরে ছুটে চলেছে!

মানিক বললে, ডাকাতরা আমাদের আক্রমণ করবার জন্যে কি, মোটরে করে দলবল নিয়ে এল?

আচম্বিতে অরণ্যের ভিতরে দূরে একটা ভয়ানক শব্দ হল। সকলে সবিস্ময়ে শুনছে, এমন সময়ে আবার সেই রকম আর-একটা শব্দ।

অমিয় বললে, এ যে কোনো accident-এর শব্দ!

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি এগিয়ে শুকনো গলায় বললে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, accident-ই বটে! আমাদেরই সর্বনাশ হল বোধহয়!

যেখানে তাদের গাড়ি ছিল, সেখানে গিয়ে দু-খানা মোটরই আর খুঁজে পাওয়া গেল না। জয়ন্ত তিক্ত স্বরে বললে, আমরা এখন অসহায়! আমাদের অদৃশ্য শত্রু এসে দু-খানা মোটরই চালিয়ে ছেড়ে দিয়েছে, আর চালকহীন গাড়ি দু-খানা খানিক দূরে এগিয়েই গাছে কি পাহাড়ে ধাক্কা লেগে ভেঙে গুড়ো হয়ে গিয়েছে।

সুন্দরবাবু বললেন, হুম! তাতে শত্রুদের লাভ?

জয়ন্ত বললে, আমাদের পালাবার পথ বন্ধ হল। হয়তো শত্রুরা এখনি আমাদের আক্রমণ করবে।

সুন্দরবাবু বললেন, হুম! আমি এখন পায়ে হেঁটেই পালাতে চাই। এ-বিষয়ে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তোমরা আসো আর নাই-ই আসো, এই আমি দৌড় মারলুম!

সুন্দরবাবু সত্য সত্যই সকলের মায়া কাটিয়ে দৌড় দিলেন, কিন্তু জয়ন্ত এক লাফে তার সুমুখে গিয়ে পড়ে বললে, সুন্দরবাবু, একটু দাঁড়ান! বোধহয় আমরাও আপনার সঙ্গী হতে বাধ্য হব!

হঠাৎ পিছনে একটা অদ্ভুত শব্দ শোনা গেল। মাটির উপরে ধূপ-ধুপ করে পায়ের শব্দযেন একদল সৈন্য তালে তালে পা ফেলে ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে।

জয়ন্ত বললে, যা ভেবেছি তাই! ঐ ওরা আক্রমণ করতে আসছে! এখন পালানো ছাড়া উপায় নেই!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নবাব

অনেক কষ্টে মাইলের পর মাইল পাহাড়ে-পথ হেঁটে পার হয়ে পরদিন তারা যখন লোকালয়ে গিয়ে পৌছল, তখন বেলা দুপুর। তাদের দুঃখের পাত্র পূর্ণ করবার জন্যে বৃষ্টি পড়ছে তখনো। এবং সে বৃষ্টি সে-দিন সো-রাত আর থামবার নাম করলে না।

লোকালয়ে পৌছে তারা প্রথমেই পেল পুলিশের একটা ফাঁড়ি। জয়ন্ত ও মানিক ছাড়া বাকি সকলের শরীরের অবস্থা হয়েছিল এমন ভয়ানক যে, ফাঁড়ির সামনে গিয়ে তারা একেবারে ভেঙে পড়ল। কাজেই জয়ন্ত ও মানিক বাধ্য হয়ে তাদের নিয়ে ফাঁড়ির ভিতরেই প্রবেশ করল। তাদের অবস্থা দেখে, কাহিনী শুনে ও পরিচয় পেয়ে দারোগা পীর মহম্মদ সাহেব সকলকে যার-পর-নাই আদর-যত্ন করলেন এবং সেদিনকার মতো তাদের ফাঁড়ির ভিতরেই থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন।

কালকের রাত্রের দুঃস্বপ্ন জয়ন্তর মতো লোককেও আজ পর্যন্ত বিস্ময়ে অভিভূত করে রেখেছে। সে কী নিরেট অন্ধকার! যেন মুগুরের বাড়ি মারলে সশব্দে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়! সে কী দুর্যোগ! যেন ঝড় আর বৃষ্টি তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেই উন্মত্ত ও নিষ্ঠুর আনন্দে আকাশ ও পৃথিবীকে ব্যাকুল করে তুলেছিল অশ্রান্তভাবে। সে কী বিভীষিকা! প্রেতাত্মাজগতের সিংহদ্বার খোলা পেয়ে যেন মূর্তিমান অভিশাপের দল সেদিন মানুষের জগৎ আক্রমণ করেছিল!

সেই মুহুর্মুহু নব নব ভয়-বিস্ময়ের অভিনয়ের ক্ষেত্রে বৃষ্টির কনকনে শীতলতায়, বজ্রসাখী। ঝড়ের ঝাপটায় ও ধাক্কায়, কখনো উপল-সঙ্কুল দুর্গম পার্বত্য চড়াই-উৎরাইয়ের ভিতর দিয়ে, কখনো বর্ষাধারায় হঠাৎ-বেগবতী নদীর তীব্র স্রোত ঠেলে ঠেলে, তীক্ষ্ণ কাঁটাঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে এবং কখনাে বা ধু-ধু খোলা মাঠের তৃণহীন পিচ্ছিল পাথুরে জমির উপর আছাড় খেয়ে তারা প্রাণপণে পালিয়ে আসবার চেষ্টা করছে—এবং তাদের পিছনে পিছনে বরাবর ধেয়ে এসেছে সে যে কারা কেউ তা জানে না, কেবল তাদের কানের কাছে একটানা সমানে বেজে বেজে উঠেছে সেই মহা-অমানুষিক আশ্চর্য পায়ের শব্দ-একদল সৈন্য যেন সমতালে পা

ফেলতে ফেলতে ক্রমাগত এগিয়ে আসছে, আসছে আর আসছে আর আসছে—সে ভয়াবহ প-গুলো যেন থামতে জানে না, যেন কখনো থামবেও না, যেন তারা চিরদিন ধরে এই মাটির পৃথিবীতে দলিত, শব্দিত ও স্তম্ভিত করে চলে চলে বেড়াবে!

উঃ! সে কথা ভেবে ভেবে জয়ন্ত এখনো থেকে থেকে শিউরে শিউরে উঠতে লাগল। জয়ন্তর দেহ লম্বায় ছয় ফুট চার ইঞ্চি, তার বুকের ছাতি পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি চওড়ায় এবং তার ব্যায়ামপুষ্ট সুদীর্ঘ দেহকে দেখায় ঠিক দানবের দেহের মতো। মানিকের দেহ অতটা জাঁকালো দেখতে না হলেও যে-কোন পালোয়ানেরই মতো বলবান। কিন্তু তাদের এমন বলিষ্ঠ দেহও কালকের রাত্রের ব্যাপারে যথেষ্ট কাবু হয়ে পড়েছে। দলের অন্যান্য লোকেদের কথা না তোলাই ভালো। তারা আজ শয্যাশায়ী, উত্থানশক্তিশূন্য।

কিন্তু কে তারা এমন একতালে পা ফেলে ফেলে আসে? মাঝে মাঝে বিদ্যুৎআলোতে কতকগলো। ধবধবে সাদা মূর্তির মতো কি যেন দেখা গিয়েছে, কিন্তু সেটা চোখের ভ্রমও হতে পারে। মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক হি-হি-হি-হি হাসিও শোনা গিয়েছে। হাসেই বা কে, আর আসেই বা কারা? অনেক মাথা ঘামিয়েও জয়ন্ত কিছুই আন্দাজ করতে পারলে না।

আর একটা জায়গায় তার মনে খটকা লেগে রয়েছে। ভোরবেলায় পূর্ব আকাশে উষা যেই সিঁথায় সিঁদুরের রেখা টেনেছিলো, কোথা থেকে বনমুরগি জাগরণের প্রথম ডাক ডেকে উঠেছিলো, আবছা আলো এসে অন্ধকারকে কাঁচের মতো স্বচ্ছ করে তুলেছিল, অমনি থেকে গিয়েছিলো তাদের পিছনকার সেই একগুঁয়ে পায়ের শব্দগুলো। যারা তাদের আক্রমণ করেছিল। তবে কি তারা রাত্রির রহস্যযাত্রী-প্রভাতকে তারা ভয় করে?

কিন্তু এক বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ নেই। জয়ন্ত জানে, সে ঠিক সূত্রই ধরেছে—ঐ গোরস্থানে বা তার আশেপাশেই আছে সমস্ত রহস্যের মূল। ওখানে ভাসা-ভাসা যাদের দেখেছে এবং যাদের হাসি ও পায়ের শব্দ শুনেছে, তারাই হচ্ছে আসল পাপী ও অপরাধী। নইলে একটা পোড়ো শহরের পরিত্যক্ত গোরস্থানের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সাধু ব্যক্তিরা লুকিয়ে রাত্রিবাস করতে আসে না, নইলে বাইরে থেকে কেউ সেখানে এসেছে জেনে মোটর গাড়ি ভেঙে তারা পালাবার পথ বন্ধ করে দেয় না, নইলে অকারণে কেউ কারুকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয় না।

আজ সকালে সে যদি ঘটনাস্থলে থাকতে পারতো, তাহলে কতটা সুবিধাই হতো! ওখানে নিশ্চয়ই আরো অনেক আবিষ্কার করা যেতে পারে।

কিন্তু আজ আর ওখানে যাবার কোনো উপায় নেই। তাদের গাড়ি দু-খানা শত্রুর চক্রান্তে ভেঙে গুড়িয়ে গেছে, তাদের সঙ্গীদের গতরও চূর্ণ হয়ে গেছে—তার উপর এই অশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি।—একটা মূল্যবান দিন মিথ্যা নষ্ট হল।

লম্বা ঘরে পাশাপাশি ছয়খানা খাটিয়ায় জয়ন্ত, মানিক, সুন্দরবাবু, অমিয়, নিশীথ ও পরেশ আশ্রয় নিয়েছে। সন্ধ্যার কিছু আগে তাদের জন্যে চা এলো, আর সকলের সঙ্গে সুন্দরবাবুও নিতান্ত চা খাবার লোভেই নারাজভাবে উঠে বসলেন। কিন্তু পিয়ালায় প্রথম চুমুক দিতে গিয়েই তিনি করে উঠলেন আর্তনাদ।

জয়ন্ত বললে, কী হলো সুন্দরবাবু? হঠাৎ অমন করে উঠলেন কেন?

সুন্দরবাবু ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, হুম! অমন করে উঠলুম কেন? জেনে—শুনে ন্যাকা সাজা হচ্ছে? মনে নেই, কাল পাহাড়ের উপর থেকে এই বুড়ো বয়সে ডিগবাজি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিলুম? এখনো চোয়াল নাড়বার জো নেই!

জয়ন্ত বললে, ও! আচ্ছা, এইবারে মনে থাকবে!

সুন্দরবাবু বললেন, তোমার পাল্লায় পড়েই তো আজ আমার এই দুর্দশা! দিব্যি সুখে ছিলুম, মরতে আমায় ভূতে কিলোলো, তাই তোমার সঙ্গে বেড়াতে এসেছি! এ কী কাণ্ড রে বাবা! ভূতে-মানুষে টানাটানি! নিতান্ত এখনও পরমায়ু আছে, তাই এতো বড়ো ফাঁড়া কাটিয়ে উঠেছি। হুম, কাল সকালেই আমি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাব। জয়ন্ত, মানিক, তোমরাও বাঁচতে চাও তো আমার সঙ্গে চলো। অমিয়বাবু, আমি আপনাকে আগেই বলেছি, আর এখনও বলছি, আপনি শীগগির ভালো রোজা ডাকুন। আপনার বোনকে উদ্ধার করা পুলিশ কি শখের

ডিটেকটিভের কাজ নয়! কুমারী শীলাকে ভূতে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে—আপনি রোজা ডাকুন!

কিন্তু অমিয় মোটেই সুন্দরবাবুর দামি উপদেশ শুনছিলো না। সে এতক্ষণ চা পান করতে করতে জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলো এবং হঠাৎ এখন চমকে দাঁড়িয়ে উঠলো। তারপর চায়ের পেয়ালাটা সশব্দে টেবিলের উপরে রেখেই ঝড়ের মতো বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘরের ভিতরে বসে যখন সকলে সবিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে, তখন রাস্তা থেকে অমিয়র উচ্চ চিৎকার শোনা গেল—জয়ন্তবাবু! মানিকবাবু! শীগগির আসুন— তাকে ধরেছি!

ঘরের ভিতর থেকে সবাই ছুটে বাইরে গিয়ে পড়লো—এমনকি সুন্দরবাবু পর্যন্ত তাঁর ডিগবাজি খাওয়ার বিষম ব্যথা ভুলে গেলেন।

বাইরে বেরিয়েই দেখা গেলো, একটা দীর্ঘকায় লোক অমিয়কে ধাক্কা মেরে পথের উপরে ফেলে দিলে—তারপর হন হন করে এগিয়ে চললো। যে-রকম অনায়াসে অমিয়কে সে ভূতলশায়ী করলে তাতে বেশ বোঝা গেলো যে, তার শরীরে রীতিমতো ক্ষমতা আছে। কিন্তু অমিয় তবু ভয় পেলো না বা তাকে ছেড়ে দিলো না, সে মরিয়ার মতো পরমুহূর্তেই মাটি থেকে উঠে। ছুটে গিয়ে আবার তাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরলে। এবার তার হাত ছাড়াবার আগেই আরসকলে গিয়ে লোকটাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললে ।

অমিয় হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, এই সেই লোকটা। যেদিন শীলা চুরি যায়, সেদিন একেই আমি ভাঙা মসজিদের ভেতরে দেখেছিলুম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ডাকাতরা যখন আমাদের আক্রমণ করেছিলো, তখন এই লোকটাই হা-

হা করে হেসেছিলো। পথ দিয়ে আজ ফাঁড়ির দিকে বার বার তাকাতে তাকাতে এ যাচ্ছিল, কিন্তু আমি দেখেই একে চিনতে পেরেছি!"

নিশীথ পরেশ একবাক্যে বললে, হ্যাঁ, এই সেই লোক!

জয়ন্ত লোকটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলে। দীর্ঘদেহ, ঘোর কালো মুখের উপর লম্বা কালো চুলগুলো ঝুলে পড়েছে, পরনেও কালো ওভারকোট ও কালো পাজামা। তার তীক্ষ্ণ চোখ দুটো দেখলেই গোখরো সাপের চোখের কথা মনে হয়। সে-রকম চোখ কেউ কখনো দেখেনি বোধহয়! সে চোখ দুটোতে যেন পলক পড়ে না! তাদের ভিতর থেকে এমন একটা দুষ্ট ক্ষুধার ভাব ফুটে উঠছে যে একবার দেখবার পর কেউ জীবনে আর কখনো সেই দুটো চোখকে ভুলতে পারবে বলে মনে হয় না।

দারোগা মহম্মদ সাহেবও গোলমাল শুনে এসে পড়েছিলেন। তিনি লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কী?

— হাজী নবাব আলি।

—এই বাবুদের তুমি চেনো?

—না। ওঁদের আমি কখনো দেখিনি, ওঁরা কী বলছেন তাও বুঝতে পারছি না।

—আলিনগরের ভাঙা মসজিদে তুমি কী করতে গিয়েছিলে?

—জীবনে কোনোদিন আমি আলিনগরেই যাইনি।

অমিয় বললে, মিথ্যে কথা!

নবাবের সাপের মতো চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেলো। কিন্তু মুখে সে শান্ত হাসি হেসে বললে, আমি হাজী! মিথ্যে বলা আমার পাপ।

মহম্মদ সাহেব বললেন, তুমি হাজীই হও আর কাজীই হও আর পাজীই হও, আজ তোমাকে ফাঁড়িতে বন্ধ থাকতেই হবে। এখন আমার সময় নেই, কাল সকালে তোমাকে ভালো করে পরীক্ষা করবো।

নবাবের চোখ আবার ধক করে জ্বলে উঠলো। সে বললে, কোন আইনে আপনি আমাকে বন্ধ করে রাখতে চান?

মহম্মদ সাহেব বললেন, আইনের কথা তুমি সেই উকিলদেরই জিজ্ঞাসা কোরো। আমি উকিল নাই—আমি দারোগা। এই সেপাই! একে নিয়ে যাও—

গভীর রাত্রে ঘুমন্ত সুন্দরবাবুর মনে হলো কে যেন তার কানের কাছে হি-হি-হো-হো করে অট্টহাসি হেসে উঠলো।

জেগে বিছানার উপরে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সুন্দরবাবু চাঁচাতে লাগলেন—জয়ন্ত! জয়ন্ত! তারা এসেছে—তারা এসেছে—তারা এসেছে!

সেই বিষম চিৎকারে ঘরসুদ্ধ লোকের ঘুম ভেঙে গেলো।

জয়ন্ত বললে, অত চাঁচাচ্ছেন কেন সুন্দরবাবু, কী হয়েছে?

—হুম!! আমার কানের কাছে একটা বিদঘুটে হাসি শুনলুম!

—পাগল নাকি?

বৃষ্টির জন্যে ঘরের সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ ছিল। অমিয় আলো জেলে বললে, কই, ঘরে তো আর কেউ নেই!

জয়ন্ত বললে, সুন্দরবাবুর ঘাড়ে স্বপ্নভূত চেপেছে!

সুন্দরবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, হ্যাঁ হে, হাঁ! তবু তো আমার ঘাড়ে স্বপ্নভূত চেপেছে, কিন্তু তোমার ঘাড়ে চেপেছে যে, আসল ভূত সে খেয়ালটা আছে ক?

হুম, অট্টহাসিতে আমার কান গেলো ফেটে, আমার ঘুম গেলো ভেঙে, তবু ওঁদের বিশ্বাস হচ্ছে না!

মানিক একটা জানলা খুলে দিলে। ঘরের ভিতর এসে ঢুকলো হু-হু করে জোলো হাওয়া। বৃষ্টিপাতের শব্দে বাইরের অন্ধকার মুখরিত।

কিন্তু মানিকের কান আর-একটা কিছু শুনলে। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে সমতলে পা ফেলে কারা চলে যাচ্ছে।

সে শব্দ জয়ন্তও শুনতে পেলে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে সে গভীর স্বরে বললে, 'এসো মানিক!' এবং তারপরেই দরজা খুলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেও তার পিছনে চললো।

নবাব যে-ঘরে বন্দী ছিলো জয়ন্ত সিধে সেই ঘরের সুমুখে গিয়ে দাঁড়ালো। ঘরের দরজা খোলা-ভিতরে নবাব নেই।

সুন্দরবাবু বলে উঠলেন, ফুসমন্ত্র... ফুসমন্ত্র! ফুসমন্ত্রে নবাব উড়ে গেছে, আর যাবার সময়ে ফুসমন্ত্রেই আমার কানের কাছে মুখ এনে হেসে গেছে!

জয়ন্ত বললে, ফুসমন্ত্রের নিকুচি করেছে! এই দেখুন, দরজার তালায় চাবি লাগানো রয়েছে। বাইরে থেকে কেউ তালা খুলে নবাবের পালাবার সুবিধা করে দিয়েছে।

সুন্দরবাবু বললেন, হুম! কে সে? নিশ্চয়ই মানুষ নয়!

জয়ন্ত বললে, যদি কোনো মূর্তিমান অলৌকিক শক্তি এসে দরজা খুলতে চাইতো তাহলে কুলুপ আপনি খুলে যেত, এর মধ্যে আবার চাবি ঢুকিয়ে কুলুপ খুলতে হতো না। যখন চাবির দরকার হয়েছে তখন বুঝতে হবে যে, আমাদেরই মতো কোনো রক্ত-মাংসের হাত এই দরজার কুলুপ খুলেছে। আরো একটা

ব্যাপার বেশ বোঝা যাচ্ছে। অমিয়বাবু ঠিক লোককেই ধরেছেন!! এই নবাব আলি যেই-ই হোক, নিশ্চয়ই সে অপরাধিদের একজন। হয়তো সে-ই দলপতি, নইলে এমন করে পালিয়ে যেতো না।

নিশীথ বললে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে ফাঁড়ির ভিতরে নবাবের পালাবার সাহায্য করলে কে?

মানিক বললে, দরজার সামনে যে একজন চৌকিদার ছিল, সে কোথায় গেলো?

সুন্দরবাবু বললেন, এও বুঝতে পারছে না? ফুসমন্ত্রে উড়ে গেছে!

জয়ন্ত লণ্ঠনটা মাথার উপরে তুলে এদিকে ওদিকে চেয়ে দেখলে।

মানিক এগিয়ে যেতে যেতে বললে, "উঠানের উপরে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে ও কে বসে আছে?

সেই চৌকিদার। মানিক তার কাঁধে হাত দিতেই সে এলিয়ে একদিকে হেলে পড়লো। মানিক সচমকে বললে, জয়, এ একেবারে মরে কাঠ হয়ে আছে! কিন্তু এর গায়ে কোথাও আঘাতের চিহ্ন নেই!

জয়ন্ত লণ্ঠন নিয়ে এগিয়ে চৌকিদারের মরা মুখ দেখেই স্তম্ভিত হয়ে গেলো। তার ভুরু দু'টো কপালের দিকে উঠে গেছে, তার চোখ দু'টো বিস্ফোরিত হয়ে যেন বাইরে ঠিকরে পড়তে চাইছে এবং তার মুখ হাঁ করে আছে। মৃত মানুষের মুখে এমন ভীষণ ভয়ের চিহ্ন সে আর কখনো দেখেনি। সে যেন চোখের সামনে নরক-দৃশ্য দেখেই আত্মহারা হয়ে মারা পড়েছে!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রান্তর-সমুদ্রে

খানিকক্ষণ পরে জয়ন্ত ধীরে ধীরে বললে, হ্যাঁ, এ লোকটিকে কেউ খুন করেনি। কেবল ভয় পেয়েই এ মারা পড়েছে।

মানিক বললে, ভেবে দেখ জয়, যা দেখলে মানুষ মারা পড়তে পারে, সেটা কতদূর ভয়ানক দৃশ্য!

সুন্দরবাবু বললেন, এই চৌকিদার বেচারা চোখের সামনে নিশ্চয় কোনো আস্ত জলজ্যান্ত ভূত দেখেছিলো!

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, আস্ত বা আধখানা, জ্যান্ত বা মরা—কোনোরকম ভূত-টুতই আমি বিশ্বাস করি না। চৌকিদার সত্যই যদি কোনো ভূত দেখে থাকে তবে বুঝতে হবে যে, ভূতের ছদ্মবেশে সে কোনো মানুষকেই দেখেছে।

ইতিমধ্যে মহম্মদ সাহেব ও থানার অন্যান্য লোকেরাও গোলমাল শুনে বেরিয়ে এসে ব্যাপার দেখে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

মৃত চৌকিদারের সেই ভয়বিকৃত ভয়ানক মুখ এবং বিস্ফারিত ও স্তম্ভিত দৃষ্টি আর তাকিয়ে দেখে সহ্য করা যাচ্ছিল না, একজন তাড়াতাড়ি গিয়ে লাশের উপরে কাপড় চাপা দিলে।

মহম্মদ ভাবতে ভাবতে বললেন, ঈশাক খুব সাহসী চৌকিদার ছিলো, শয়তানের সুমুখে গিয়েও বোধহয় দাঁড়াতে ভয় পেতো না। অথচ বেশ বোঝা যাচ্ছে, বিষম ভয়েই তার প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছে। তাকে এমন আশ্চর্য ভয় কারা

দেখালে? নবাব ছিল ঘরের ভিতরে বন্ধ, আর দরজার কুলুপের চাবি ছিল ঈশাকের পকেটে। কারা এসে সেই চাবি নিয়ে দরজা খুলে নবাবকে খালাস করে দিলে? বুঝতে পারছি, নবাবের একটা দল আছে। কিন্তু তারা এর মধ্যে খবর পেলে কেমন করে? সুন্দরবাবু, আপনি তো কলকাতা পুলিশের পুরানো আর পাকা লোক, আজকের রহস্য কিছু বুঝতে পারছেন কি?

সুন্দরবাবু বিষন্নভাবে মাথার টাকে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, হুম! এর মধ্যে আর না-বোঝবার কী আছে? আমি তো গোড়া থেকে বলছি, এ-সব হচ্ছে ভৌতিক ব্যাপার! শীগগির রোজা না ডাকলে আমাদের সবাইকেই অমনি দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে মরে থাকতে হবে।

হঠাৎ মানিক বলে উঠল, আচ্ছা, এইমাত্র এখানেও তো আমরা তালে তালে পা ফেলে কাদের চলে যেতে শুনেছি। কে তারা?

গোলে-হরিবোলে জয়ন্তও এতক্ষণ সে কথাটা ভুলে গিয়েছিলো। সেও উত্তেজিত স্বরে বলে উঠল, মানিক, মানিক! শীগগির আমাদের বন্দুকগুলো আনাে! তারাই হচ্ছে নবাবের দল!

মহম্মদ সাহেব, আর এক মিনিটও দেরি নয়—চলুন আমরা তাদের পিছনে ছুটি,—তারা এখনো বেশি দূরে পালাতে পারেনি।

মহম্মদ নারাজ হলেন না। তখনি সশস্ত্র হয়ে সবাই থানা থেকে বেরিয়ে পড়লো।

মহম্মদ জিজ্ঞাসা করলেন, জয়ন্তবাবু, তাদের দলে কতো লোক আছে?

—জানি না। হয়তো ছ সাতজন, হয়তো আরো বেশি।

—তাদের দেখেই কি ঈশাক মারা পড়েছে?

—হতে পারে।

—"দর থেকে খালি কতকগুলো অস্পষ্ট সাদা সাদা মূর্তি দেখেছি।

সকলে একটা তে-মাথার উপর এসে দাঁড়িয়ে পড়লো।

তখনো ঝরিছে সেই অশ্রান্ত বৃষ্টি এবং থেকে থেকে কেঁদে কেঁদে উঠছে ঝোড়ো বাতাস। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কালো মেঘ থেকে ঘন অন্ধকারও যেন পৃথিবীর বুকে ঝর-ধর করে ঝরছে ক্রমাগত। সেই জমাট অন্ধকারকে ছাঁদা করে পুলিশদের লণ্ঠনের আলো বেশি দূর অগ্রসর হতে পারছিলো না।

মহম্মদ বললেন, এইবারই তো মুশকিল! পথ গিয়েছে তিন দিকে, কিন্তু সেই বদমাইশরা গিয়েছে। কোন দিকে?

জয়ন্ত বললে, এক কাজ করা যাক। মহম্মদ সাহেব আর সুন্দরবাবু যান সামনের দিকে। অমিয়বাবু, নিশীথবাবু যান বাঁদিকে, আমি আর মানিক যাই ডানদিকে। সব দলেই জন-কয় করে চৌকিদার থাকুক।

মহম্মদ বললেন, এ-ব্যবস্থা মন্দ নয়। যে-দল প্রথমে শত্রুর দেখা পাবে, তখনি যেন তিনবার বন্দুক ছেড়ে। তাহলেই অন্য দু-দল তাদের সাহায্য করতে যেতে পারবে।

ডানদিকের পথ হচ্ছে আলিনগরে যাবার পথ। জয়ন্তর ধারণা, নবাব সদলবলে এই পথই ধরেছে। জয়ন্ত ও মানিকের সঙ্গে রইলো ছয়জন চৌকিদার।

জলমাখা অন্ধকারের গায়ে বার-বার ধাক্কা খেতে খেতে দুটো লণ্ঠনের আলো অগ্রসর হচ্ছে এবং তারই পিছনে চলেছে জয়ন্ত, মানিক ও চৌকিদাররা। দুই ধারের ঘনবিন্যস্ত গাছপালার মধ্য দিয়ে বয়ে যাচ্ছে যেন বজ্রাগ্নিদগ্ধ বিনিদ্র রাত্রির যন্ত্রণাভিরা একটানা দীর্ঘ নিশ্বাস। চিরকাল যারা কালো রাত্রির সঙ্গী, সেই

নিশাচর। পেচক ও বাদুড়দেরও আজ দেখা নেই এবং শৃগালরাও আজ এই বীভৎস রাত্রের কালিমার চেয়ে গর্তের অভ্যস্ত কালিমাকে নিরাপদ ভেবে শিকারের লোভ ছেড়ে বাসার ভিতরে বসে আছে। ঘ্যানঘেনে ঝিঁঝিপোকাগুলোও মুখ বুজে যেন কোনো অভাবিত অমঙ্গলের জন্যে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে।

বৃষ্টি, বাতাস ও তরুমর্মর ছাড়া কোথাও আর কোনো শব্দই শোনা যাচ্ছে না।

জয়ন্ত এগুতে এগুতে বারংবার বলছে, 'আরো তাড়াতাড়ি—আরো তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলো। তারা অনেকটা এগুবার সময় পেয়েছে, তবু তাদের ধরতে হবেই!' যে দুনিয়ায় আজ কীটপতঙ্গের মতো জীবেরও সাড়া নেই। সেখানে মানুষের এই উৎসাহিত কণ্ঠস্বর কী অস্বাভাবিকই শোনাচ্ছে! তার গলার আওয়াজ শুনে গর্তেৰ ভিতরে ঘুমন্ত বন্য পশুরা সভয়ে চমকে জেগে উঠতে লাগলো।

লোকালয় পিছনে ফেলে তারা এখন একটা বনের ভিতরে এসে পড়েছে। মানিক হতাশ কণ্ঠে বললে, জয়, হয়তো তারা। এ-পথে আসেনি।

জয়ন্ত বললে, অন্য দুটো পথের দিক থেকেও তো আমাদের কারুর বন্দুকের আওয়াজ শুনছিনা। তুমি কি বলতে চাও তারা কোনো পথে না গিয়ে হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে? তুমিও কি ভূত মানো? যতক্ষণ না ওরা বন্দুক ছেড়ে, ততক্ষণ আমাদের এগিয়ে যেতে হবেই।

—কিন্তু যদি তারা এই বনে ঝোপেঝাপে কোথাও গা-ঢাকা দেয়? অন্ধকারে তাদের কি আর খুঁজে বের করতে পারবো?

—সে মুশকিলের সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু তবু থামলে আমাদের চলবে না। এগিয়ে চলো—আরো তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলো!

সারা বন যেন আজ বিভীষিকার মদে মাতাল হয়ে টলোমলো। বড়ো বড়ো গাছের ডালপাতার জালে বাঁধা পড়ে ঝোড়ো হাওয়া কখনো করছে তীক্ষ্ণ স্বরে হাহাকার, কখনো করছে ভৈরব বিক্রমে ভীষণ গর্জন। সেইসঙ্গে ছোট-বড়ো দমকা হাওয়ার দল গলা মিলিয়ে আরো যে কতো রকম অদ্ভুত আওয়াজে চতুর্দিক পরিপূর্ণ করে তুলেছে, তা বর্ণনা করবার ভাষা কারুর কলমে নেই।

বন শেষ হলো-তারপরেই সকলে একটা মাঠের উপরে এসে পড়লো। একজন চৌকিদার লণ্ঠনটা উঁচু করে তুলে ধরে সামনের দিকে দেখবার বৃথা চেষ্টা করে বললে, হুজুর, মাঠে জল থৈ-থৈ করছে, পথ আর দেখা যাচ্ছে না।

জয়ন্ত দৃঢ়স্বরে বললে, জল ভেঙে এগিয়ে চলো।

—কিন্তু কোনদিকে যাব? পথ কোথায়?

—সোজা চলো।

—এই মাঠে যে খান-ডোবা-পুকুর আছে! যদি কোনো পুকুরে গিয়ে পড়ি?

—আমি তোমাকে টেনে আবার ডাঙ্গায় তুলবো। কিন্তু এগিয়ে চলো—এগিয়ে চলো!

আর একজন চৌকিদার বললে, হুজুর, এ-মাঠে এখন কোমর ভোর জল আছে, তার ওপরে এ-হচ্ছে বানাে জল-এর টানে আমরা ভেসে যেতেও পারি।

জয়ন্ত বললে, এই জল ভেঙে নবাব যখন তার দলবল নিয়ে যেতে পেরেছে, তখন আমরাই বা ভেসে যাব কেন?

—না হুজুর, নবাবরা নিশ্চয় এদিকে আসেনি।

—যদি এসে থাকে, তাহলে তারা ঐ বনের ভিতর লুকিয়ে আছে।

জয়ন্ত ও মানিক বুঝলে, চৌকিদাররা আর এক পা এগুতে রাজী নয়। আর তাদেরই বা দোষ কী? এই অন্ধকার, এই ঝড়ের দাপট, মাঠ দিয়ে এই বন্যার মতো জলপ্রবাহ, এই অবিরাম বৃষ্টির কনকনে ঝাপটা—যা তাদের হাড়ের ভিতর পর্যন্ত ভিজিয়ে সাঁতসেঁতে করে দিয়েছে, তার উপরে অজানা ভয়ানক শত্রুর ভয় তো আছেই। আর, সে বড়ো যে-সে। শত্রু নয়— কেবলমাত্র তাদের স্বচক্ষে দেখেই সাহসী চৌকিদার ঈশাক ইহলোক ছেড়ে পালিয়ে না গিয়ে পারেনি।

জয়ন্ত ও মানিক দোমনা হয়ে অতঃপর কী করা উচিত। তাই ভাবছে, এমন সময় দেখা গেল। সেই জলমগ্ন প্রান্তরের মাঝখানে নিবিড় অন্ধকারের গলায় ঝুলছে যেন একসার আলোর মালা।

জয়ন্ত চমকে বলে উঠলো, ও কী ব্যাপার!

চৌকিদাররা বললে, আলেয়া!

মানিক বললে, এতক্ষণ ও-আলোগুলো কোথায় ছিলো?

জয়ন্ত উচ্চৈঃস্বরে গুনলে, এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়! মানিক, মানিক, আবার সেই ভয়ঙ্কর ছয়!

—তাহলে ওরাই হচ্ছে নবাবের সাঙ্গোপাঙ্গ! আঁধারে গা ঢেকে ওরা তো বেশ পালিয়ে যাচ্ছিল, মরতে আলো জ্বেলে আবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে কেন?

—আর একটা কথা বুঝে দেখো মানিক। আমাদের লণ্ঠন দু'টো সমানে জ্বলছে; এ-আলো ওরা দেখেছে, আর নিশ্চয়ই বুঝেছে যে আমরা ওদের ধরবার জন্যেই ছুটে এসেছি। সেটা বুঝেও ওরা আমাদের চোখের সামনেই আলো জ্বালতে ভয় পায়নি।

—তাহলে কি হঠাৎ ওদের আরো অনেক নতুন লোক এসেছে? ওরা কি ভাবছে যে, আমাদের আর ভয় করবার দরকার নেই?

—ওরা কী ভাবছে তা কে জানে! এসো, আগে আমরা তিনবার বন্দুক ছুড়ে আর সবাইকে জানিয়ে দি যে, শত্রুদের দেখা পাওয়া গেছে!

জয়ন্ত ও মানিক তিনবার বন্দুক ছুঁড়লে—তার তীব্র শব্দে চারিদিক ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো।

দূর থেকে আঁধার রাত্রির বক্ষ ভেদ করে আরো কয়েকটা বন্দুকের গর্জন বাতাস-তরঙ্গের ভিতর দিয়ে শব্দ-তরীর মতো ভেসে এলো। বোঝা গেলো, আর সবাই তাদের সঙ্কেত শুনেই সাড়া দিলো এবং শীঘ্রই তারা তাদের কাছে এসে হাজির হবে।

জয়ন্ত বললে, আমরা কোথায় আছি, আলো জেলে রেখে শত্রুদের সেটা আর দেখিয়ে দেবার দরকার নেই। লণ্ঠন দু'টো নিবিয়ে ফেলো।

কিন্তু ইতিমধ্যেই আর-একটা ব্যাপার আবিষ্কার করে মানিক উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলো, জয়, জয়! ওদের আলোগুলো যে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

সত্যই তাই! ছয়টা আলো দুলতে দুলতে জয়ন্তদের দিকেই অগ্রসর হচ্ছে।

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি বললে, আলো নেবাও! ওরা আমাদের আক্রমণ করতে আসছে।

চৌকিদাররা চটপট আলো নিবিয়ে ফেলল।

তারপর ওদিককার আলোগুলো আসতে আসতে থেমে পড়লো।

জয়ন্ত বললে, ‘এসো আমরা জলে নেমে খানিকটা এগিয়ে থাকি। আমাদের দলবল এসে পড়লেই আমরা ওদের আক্রমণ করবো। বন্দুক তৈরি রাখো, ওরা কাছে আসবার বা পালাবার চেষ্টা করলেই যথাসময়ে আমাদের আত্মরক্ষা বা-আক্রমণ করতে হবে।

জয়ন্ত ও মানিকের সঙ্গে চৌকিদাররাও অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও জলের ভিতরে নামল। জল কোথাও প্রায় কোমর পর্যন্ত, কোথাও তার চেয়ে কম।

আঃ, সেই অস্বাভাবিক বৃষ্টি—আকাশে এতো জলও থাকতে পারে! সারা প্রান্তর যেন সমুদ্রের ক্ষুদ্র সংস্করণে পরিণত হয়েছে এবং ঝড়ের উদামতা তার মধ্যে রীতিমতো তরঙ্গের পর তরঙ্গ সৃষ্টি করছে। ধারাপাতের রমঝম রমঝম ধ্বনির সঙ্গে জেগে আছে সেই সুবৃহৎ প্রান্তরদীঘির পাগলা স্রোতের কলকল কলকল শব্দ। সে জলের কী প্রচণ্ড টান! প্রতি পদেই সকলকে ঠেলে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে। তার উপরে রাত্রির কালো রঙ এতো পুরু যে প্রান্তরের মাঝে মাঝে যে গাছগুলো দাঁড়িয়ে রয়েছে, একেবারে তাদের উপরে গিয়ে পড়ে ধাক্কা না-খাওয়া পর্যন্ত কারুর অস্তিত্ব জানিবার উপায় নেই।

বহু দূরে ছয়টা আলো কালো শূন্যের কোলে কখনো দেখা দিচ্ছে, কখনো নিবে যাচ্ছে। জয়ন্তর মনে হলো, আলোগুলো যেন তাদের চেয়ে উঁচুতেই রয়েছে।

জয়ন্তই সকলের আগে-আগে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে পায়ের তলায় আর মাটি পেলে না এবং অতলের দিকে তলিয়ে গেলো। তাড়াতাড়ি জলের উপরে ভেসে উঠে সে বললে, হাঁশিয়ার! এখানে একটা পুকুর আছে!

আন্দাজে আন্দাজে পুকুরের গভীরতা এড়িয়ে অন্য দিক দিয়ে তারা আবার অগ্রসর হতে লাগলো।

মানিক সভয়ে বলে উঠলো, আমার পায়ের উপর দিয়ে সাপের মতো কি একটা সাৎ করে চলে গেলো!

জয়ন্ত বললে, সাপের মতো বলছে কেন মানিক, ওটা সাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

কজন চৌকিদার বললে, এ-সময়ে মাঝে মাঝে মাঠের জলে কুমিররাও ভেসে আসে।

জয়ন্ত বললে, হ্যাঁ, তারাও আর বাকি থাকে কেন? কেবল কুমির নয়, আমি শুনেছি বানের জলে বাঘ-ভালুকও বাধ্য হয়ে সাঁতার কাটে।

ছয়টা আলো বেশ খানিকটা কাছে এসে পড়েছে। সেগুলো এদিক-ওদিক নড়ছে বটে, কিন্তু অন্য কোনোদিকে আর অগ্রসর হচ্ছে না।

জয়ন্ত বললে, নবাব বোধহয় বুঝতে পেরেছে, আমরা তাদের সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছি। সে হয়তো দলবল নিয়ে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যেই প্রস্তুত হয়ে আছে।

মানিক নিজের বন্দুকটা আরো জোরে চেপে ধরলে। আরো কিছুদূর এগিয়ে জয়ন্ত বললে, নবাব খুব চালাক লোক বটে। দেখছো মানিক, আলোগুলো এখনো আমাদের কতো উপরে নড়াচড়া করছে? এই মাঠের কোন-একটা উঁচু জায়গা নিশ্চয় দ্বীপের মতো জলের উপরে জেগে আছে। নবাব তার দল নিয়ে তার উপরে উঠে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। যুদ্ধ বাধলে আমাদেরই বিপদ।

মানিক ভাবতে লাগলো, নবাবকে আজ তারা দেখেছে বটে, কিন্তু তার দলের লোকগুলো দেখতে কেমন? অমিয় যে বর্ণনা করেছে, তাতে তো তাদের আকৃতি অমানুষিক বলেই মনে হয়। চৌকিদার ঈশাকও তাদের চেহারায়

অমানুষিক কোনো ভাব দেখে ভয়ে মারা পড়েছে। এ-রহস্যের কারণ কী? কে তারা?

এমন সময়ে দুই-তিনবার বন্দুকের শব্দ হল।

সকলে ফিরে দেখলে, পিছনে-যেদিক থেকে তারা এসেছে সেইদিকে অনেক দূরে চারটে আলো দেখা দিয়েছে।

জয়ন্ত ও মানিক আবার তিনবার বন্দুক জুড়ে নিজেদের অস্তিত্বের কথা জানিয়ে দিলে, কারণ এই নতুন আলোগুলোর সঙ্গে আসছে যে তাদেরই বন্ধুরা সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

কিন্তু শত্রুদের আলোগুলো তখনো নিবে বা পালিয়ে গেলো না।

জয়ন্ত বললে, নবাব কী বুঝেছে তা সেই ই জানে। এতো লোক দেখেও সে ভয় পেলে না? না, বানের জলে তার পালাবার পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে, তাই সে মরিয়া হয়ে আমাদের সঙ্গে লড়াই করবো?

মানিক চোখের সুমুখে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলো, কতকগুলো ভৌতিক মূর্তি দীর্ঘ দীর্ঘ বাহু বাড়িয়ে তাদের সকলকে এগিয়ে আসবার জন্যে আগ্রহে আহ্বান করছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রক্তশূন্য মড়া

ঘুটফুটে কালোর কোলে মিটমিটে আলোর মালা। এতোগুলো বন্দুকের আওয়াজ শুনেও মালাকাররা মালা ছিড়ে পালিয়ে গেলো না।

অথচ তারা এতো কাছে এসে পড়েছে!

মানিক বললে, "জলের ভিতরে নিশ্চয়ই একটা উচু জমি আছে, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু সেই জমির উপরেই গাছপালার ভিতর থেকে যে ঐ আলোগুলো দেখা যাচ্ছে এটা এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি। জয়, ওরা হয় পাগল, নয়। মরিয়া। আমার মতে, আমাদের দল যখন সাড়া আর দেখা দিয়েছে, তখন তাদের জন্যে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত। তারপর সবাই মিলে একসঙ্গে আক্রমণ করবো।

জয়ন্ত বললে, তোমার পরামর্শই শুনব। আমাদের পুরো দলে থাকবে পাঁচশটা বন্দুক নিয়ে পাঁচিশজন লোক। এদের নিয়ে দস্তুর মতো একটা খণ্ডযুদ্ধের আয়োজন করা যেতে পারে।

তারা সেইখানে প্রায় বুক সমান পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে সঙ্গীদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো।

এতক্ষণ পরে আকাশের বীজ, মেঘের বৃষ্টি ও ঝড়ের রুদ্রগতি শান্ত ও ক্ষান্ত হবার চেষ্টা করলে। তারপর যখন সদলবলে মহম্মদ, সুন্দরবাবু, অমিয়, নিশীথ ও পরেশ এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিলে, তখন বজ বৃষ্টি ও ঝড় পৃথিবীর

কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে বটে, কিন্তু অন্ধকারের নিবিড়তা ও প্রান্তর-সমুদ্রে বন্যার কলকল্লোল জেগে রইলো আগেকার মতোই।

সুন্দরবাবু এসে জয়ন্তর সুবৃহৎ দেহের উপরে হেলে-পড়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলে উঠলেন, বাস রে বাস! চরকির মতো ছুটোছুটি করে এক মিনিট যে বসে জিরিয়ে নেব তারও উপায় দেখছি না! এই অগাধ সাগরে বসে পড়লেই ডুবে যাব, আর ডুবে গেলেই ভেসে যাবে! হুম!" মানিক বললে, "ভয় কী সুন্দরবাবু, ভেসে গেলে আপনি তো চিত-সাঁতার কাটতে পারবেন।

সুন্দরবাবু ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, ঠাট্টা করো না মানিক, এ-ঠাট্টা-ফাট্টা ভালো লাগে না!

মহম্মদ বললেন, জয়ন্তবাবু, ও-গুলো নিশ্চয়ই শত্রুদের আলো?

—তাই তো মনে হচ্ছে। নইলে এই দুর্যোগে এখানে এসে দেয়ালী-উৎসব করবার শখ হবে কার?

—কিন্তু নবাবের আস্পর্ধা তো কম নয়! সে আলো জ্বেলে বসে আছে, যেন আমাদের কোনো তোয়াক্কাই রাখে না!

সুন্দরবাবু বললেন, ভূত আবার কবে মানুষের তোয়াক্কা রাখে? মানুষ হলে ওরা এতক্ষণে বাপ বাপ বলে পালিয়ে যেত!

মহম্মদ বললেন, রাতও আর বেশি নেই, কথায় কথায় সময় কাটাবারও আর দরকার নেই। চলুন, আমরা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এগিয়ে যাই, ওদের একেবারে ঘিরে ফেলি।

সকলে অর্ধচন্দ্রাকারে সামনের উঁচু জমির দিকে এই অবস্থায় যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি অগ্রসর হল। আলোগুলো তবু নেববার বা পালাবার চেষ্টা করলে না।

মহম্মদ বললেন, এখান থেকে বন্দুক ছুঁড়ে আমরা অনায়াসেই ওদের মারতে পারি! আচ্ছা, একবার বন্দুক ছুঁড়ে ওদের ভয় দেখানো যাক।

মহম্মদ ও তাঁর দেখাদেখি আরো কেউ-কেউ বন্দুক ছুঁড়লেন, ওদিক থেকে তবু কোনো উত্তরই এল না, ফিরে এল খালি তাদের নিজেদের বন্দুক-গর্জনের প্রতিধ্বনি এবং বেপরোয়া আলোগুলো তখনো অচল ।

সুন্দরবাবু রেগে তিনটে হয়ে বললেন, ওরা ভুতই হোক আর রাক্ষসই হোক, ওদের আস্পর্ধা আর আমি সইতে পারছি না! আমরা পুলিশের লোক-বিশেষ আমি হচ্ছি গিয়ে ক্যালকাটা পুলিশের লোক-আমাদের সঙ্গে চালাকি? আমি এইবার সত্যি সত্যি ওদের হাতের আলো টিপ করে গুলি ছুঁড়ব!

সুন্দরবাবু লক্ষ্য স্থির করে দু-বার বন্দুক ছুঁড়লেন। একটা আলো নিবে গেল, কিন্তু অন্য আলোগুলো তবু সরে গেল না।

অমিয় বললে, নাঃ, দেখছি ওরা এইবারে সত্যিই অবাক করলে! ওদের কি ভয়-ডর কিছুই নেই?

মহম্মদ বললেন, চল, আমরা সবাই এইবারে জমির উপরে উঠে ওদের আক্রমণ করি।

সুন্দরবাবু সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন, হুম! মহম্মদ সায়েব, আমার মনে হয় ওরা অন্ধকারে আমাদের জন্যে কোনো ফাঁদ পেতে রেখেছে! ঐ আলোগুলো হচ্ছে টোপ। এগুলে বিপদ হতে পারে!

মহম্মদ বললেন, হ্যাঁ, হতে পারে। তবু আমি এগুব। চল সবাই, হাঁশিয়ার!

সবাই অগ্রসর হল।

জয়ন্ত চুপিচুপি বললে, মানিক, আমার মনে একটা সন্দেহ জাগছে।

—কী?

—হয়ত আমরা এখনি নিরেট গাধা বলে প্রমাণিত হবো।”

—তার মানে?

—এই তো উঁচু জমির তলায় এসে দাঁড়িয়েছি। মহম্মদ সায়েব উপরে উঠে গিয়েছেন। আলোগুলো এখনো জ্বলছে। না, এ অসম্ভব!

জয়ন্ত ও মানিক পাশাপাশি থেকে জমির উপরে উঠতে লাগল। তখনো কোনো শত্রু কি বীভৎস মূর্তির সাড়া পাওয়া গেল না।

কিন্তু সাড়া পাওয়া গেল মহম্মদের। নিচে যারা ছিল তারা সবাই শুনলে, মহম্মদ বিপুল বিস্ময়ে চিৎকার করে বলছেন—কেউ এখানে নেই, কেউ এখানে নেই।

তারপরই সুন্দরবাবুর কণ্ঠস্বরঃ হুম! গাছের ডালে খালি লণ্ঠনগুলো ঝুলছে। আমাদের ভয়ে ভূতগুলো চম্পট দিয়েছে!

উঁচু জমির উপরে জল ওঠেনি। বৃষ্টি-ভেজা জমির উপরে বসে পড়ে জয়ন্ত বললে, মানিক পূর্বদিকে মেঘের পর্দা ছিড়ে গিয়েছে।

মানিক বললে, কিন্তু এ কিরকম ব্যাপার?

জয়ন্ত পূর্বকাশের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে শান্ত মৃদুস্বরে বললে, প্রথম উষার স্বপ্নময় আলো ফুটছে। বর্ষা-প্রভাতে আলোকের নবজন্ম কী মধুর!

সুন্দরবাবু এসে বললেন, “এখন তোমার কবিত্ব রাখো জয়ন্ত। নবাব কোনদিকে গেল বল দেখি?

—যেদিকে রাত্রি গেছে সেইদিকে।

—কী বলছ হে?

—যারা রাত্রির অনুচর। তারা প্রভাতের প্রতীক্ষা করে না। চেয়ে দেখুন, উষা এখন সিঁথায় সিঁদুর পরেছে। মানিক, ভৈরব রাগে এখন একটা ভজন গাইতে পারো?

বন্ধুর মাথা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেছে ভেবে জয়ন্তর মুখের দিকে মানিক কটমট করে তাকিয়ে দেখলে ।

জয়ন্ত হঠাৎ অট্টহাস্যে উচ্ছসিত হয়ে উঠল। সুন্দরবাবু ভয় পেয়ে দুই-পা পিছিয়ে গেলেন। তিনিও ঠাউরে নিলেন, জয়ন্ত পাগল হয়ে গিয়েছে, হয়ত এখনি সে তাকে কামড়ে দেবে!

মহম্মদ আশ্চর্য হয়ে বললেন, জয়ন্তবাবু, এত হাসছেন কেন? এই কি হাসবার সময়?

জয়ন্ত হাসতে হাসতেই বললে, বলেন কী মহম্মদ সায়েব। এতবড় প্রহসনেও হাসব না? ঐ লণ্ঠনগুলো আলো নয়, আলেয়ার মতোই আমাদের বিপথে চালনা করে সাত ঘাটের জল খাইয়ে, কাদা ঘাঁটিয়ে এখানে এনে ফেলেছে। বুঝেছেন? নবাব আমাদের চেয়ে ঢের বেশি চালাক। সে অন্ধকারে গাছের ডালে এই লণ্ঠনগুলো বুলিয়ে রেখে গিয়েছে কেবল আমাদেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ আমরা যখন আলোর দিকে ছুটে আসব তারা তখন অন্যদিকে ছুটে পালিয়ে কলা দেখাবার সময় পাবে। বাহাদুর নবাব, বাহাদুর! কাজেই এখন প্রভাতের সূর্যোদয় দেখা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করবার নেই।

সুন্দরবাবু বললেন, আমি ঐ হতভাগা সূর্যোদয় দেখতে চাই না!

—তাহলে কী করবেন?

—আমি এখন ঘুমোতে চাই।

—তাহলে ঘুমিয়ে পড়বার আগে নবাবের নামে একবার জয়ধ্বনি দিন।

—হুম! নিজের মুখে চুনকালি মাখিয়ে শত্রুর নামে জয়ধ্বনি দেবার ইচ্ছে আমার নেই!

—কিন্তু সুন্দরবাবু, আমার ওটুকু উদারতা আছে। আমাদের মতো এতগুলো মাথাকে যে পাঁকে ডুবিয়ে দিয়ে গেল, সে অসাধারণ ব্যক্তি! এমনধারা অসাধারণ শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে নেমে যদি কেল্লা ফতে করতে পারেন, তাহলে সেই জয়ই হবে অতুলনীয়। এতদিন পরেই তো খেলা জমে উঠল! এখন দেখা যাক কে হারে, কে জেতে।

উপরি-উপরি বিষম কর্মভোগের পর প্রায় সকলেরই শরীরের অবস্থা হলো এমন শোচনীয় যে, তার পরদিন কেউ আর বিছানা থেকে উঠবার নাম করলে না।

তার পরের দিনের রাত্রি প্রভাত হলে পর মানিক বিছানা থেকে উঠে দেখল, জয়ন্তর শয্যা শূন্য। সে কখন উঠে বেরিয়ে গিয়েছে।

সুন্দরবাবুও তখন গাত্রোত্থান করে দাড়ি কামাতে বসে গিয়েছেন।

এমন সময় মহম্মদ এসে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন।

মানিক শুধোলে, কী মহম্মদ সায়েব, এর মধ্যে নবাবের আর কোনো খবর পাননি?

তিনি বললেন, না। কিন্তু এখানকার এক মুসলমান দোকানীর একটি মেয়ে চুরি গিয়েছে।

— হাঁ। কিন্তু এবারে কেবল মেয়ে-চুরি নয়, সঙ্গে সঙ্গে খুন।

সুন্দরবাবু চমকে উঠে দাড়ির উপরে ক্ষুরের কোপ বসাতে বসাতে ভারি সামলে গেলেন।

মহম্মদ বললেন, কাল রাত্রে দোকানী বাসায় ছিল না। ঘরের ভিতরে তার প্রৌঢ় স্ত্রী আর সতেরো বছরের মেয়ে ঘুমোচ্ছিল। গভীর রাত্রে পাড়ার লোকে শুনতে পায়, দোকানীর ঘরের ভিতর থেকে মেয়ে-গলায় চিৎকার হচ্ছে। পাড়ার লোক যখন বাইরে বেরিয়ে আসে, চিৎকার তখন থেমে গেছে। কিন্তু চিৎকারের বদলে তারা তখন আর একটা শব্দ শুনতে পেলে। কারা যেন সমতালে পা ফেলে ফেলে অন্ধকারে গা ঢেকে চলে যাচ্ছে। এই পায়ের শব্দের কথা এখন এ-অঞ্চলের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই শব্দ শুনেই পাড়ার লোকের সমস্ত সাহস উবে যায়,—সকলে আবার যে যার ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দেয়। আজ সকালে উঠে সবাই দোকানীর ঘরে ঢুকে দেখে, তার মেয়ে অদৃশ্য, আর তার বউ মরে কাঠ হয়ে মেঝের উপর পড়ে রয়েছে।

সুন্দরবাবু ক্ষুর নামিয়ে ঘুরে বসে বললেন, হুম! আধখানা দাড়ি আমি পরে কামাব, আগে সব গল্পটা শুনে নিই!

মহম্মদ বললেন, খবর পেয়ে আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে হাজির হলুম। ভয়ানক দৃশ্য! একটি আধবয়সী স্ত্রীলোকের মৃতদেহ, আর তার আতঙ্কভরা চোখ-মুখ দেখে আমার ঈশাক বেচারীর মুখ মনে পড়ে গেল। ঈশাকের মুখ-চোখেও ঠিক এই রকম বীভৎস ভয়ের ভাব মাখানো ছিল। স্ত্রীলোকটির গলায় একটা মস্ত ছাঁদা, কিন্তু ঘরের কোথাও রক্তের একটুও চিহ্ন নেই। অথচ তার দেহ একেবারে সাদা, যেন সমস্ত রক্তই সেই গলার ছাঁদা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। ঘরের কোথাও

রক্ত নেই, দেহেও রক্ত নেই-অথচ গলায় অত বড় ছাদা! আমি তো হতভম্ব হয়ে গিয়েছি!

সুন্দরবাবু বললেন, আমি বরাবরই বলছি এ-সব ভুতুড়ে কাণ্ড, তা তোমরা কেউ তো আমার কথায় কান পাতবে না।

মহম্মদ বললেন, তা যদি হয়, তবে এ-সব কাণ্ডের সঙ্গে নবাবের কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ নবাবকে আমরা গ্রেপ্তার করেছিলুম, সে আমাদেরই মতো রক্ত-মাংসের মানুষ।

নিজের বিছানায় শুয়ে-শুয়ে অমিয়ও সব শুনছিল। এখন সে উঠে বসে বললে, কিন্তু আলিনগরে যে ছয়টা মূর্তি তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে এসে আমাদের আক্রমণ করেছিল, সাধারণ মানুষের মতো।

পরেশ ও নিশীথ উঠে বসে বললে, আমরাও এ-কথায় সায় দি।

মহম্মদ বললেন, সমস্ত ব্যাপারই রহস্যময়। নবাব কেমন করে পালাল? কে তার ঘরের দরজা খুলে দিলে? ঈশাক কেন মারা পড়ল? পরশু রাত্রে গাছের ডালে আলো বুলিয়ে কারা আমাদের চোখে ধুলো দিলে? কারা মেয়ে চুরি করে? কেন করে? পাড়া জাগিয়ে কারা তালে তালে পা ফেলে চলে যায়? এ-সব প্রশ্নের কোনো জবাব নেই। আমি স্থির করেছি আজই সদরে রিপোর্ট পাঠিয়ে সাহায্য চাইব।

অমিয় বললে, কিন্তু এই সব রহস্যেরই মূল আছে সেই আলিনগরের ভগ্নস্তূপের মধ্যে।

মহম্মদ বললেন, বেশ, সদর থেকে সাহায্য পেলে আমরা সদলবলে আলিনগরেও গিয়ে হাজির হতে পারব।

এমন সময়ে জয়ন্ত ফিরে এল। তার গভীর মুখে চিন্তার রেখা।

সুন্দরবাবু বলে উঠলেন, জয়ন্ত!! ভয়ানক খবর!

জয়ন্ত ভুরু কুঁচকে সুন্দরবাবুর মুখের পানে তাকিয়ে বললে, এখন কী ভয়ানক খবর থাকতে পারে, যা আমি জানি না?

—হুম! এবারে মেয়ে-চুরির সঙ্গে মেয়ের মা খুন!

—আমি জানি। এইমাত্র ঘটনাস্থল থেকেই ফিরে আসছি।

—মহম্মদ সায়েব সদর থেকে সাহায্য আনিয়ে আলিনগর আক্রমণ করবেন।

—কবে, মহম্মদ সায়েব?

—দিন চারেক পরে।

জয়ন্ত আর কিছু না বলে মানিককে ইশারা করে আবার ঘরের বাইরে গেল।

মানিক তার কাছে গেলে পর জয়ন্ত বললে, আমি আরো দিন চারেক অপেক্ষা করতে পারব না। বিশেষ, এত লোকজন নিয়ে শোভাযাত্রা করে আলিনগরে গেলে আসামীরা সাবধান হয়ে পালাতে পারে।

—তুমি কী করতে চাও?

—তুমি আর আমি কাল রাত থাকতে উঠে চুপিচুপি আলিনগরে যাত্রা করব।

—সে কি, পায়ে হেঁটে? আলিনগর যে এখান থেকে ত্রিশ-পয়ত্রিশ মাইল দূরে।

—না, এখানে আমার পরিচিত এক জমিদার-বন্ধু আছেন শুনে তীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম। তিনিই মোটর দেবেন। অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়, তুমি আমি দু-জনে যেতে পারব। আগে নিজেরা খোঁজ নিয়ে আসি, তারপর দরকার হলে মহম্মদ সায়েবের সাহায্য নেব। মানিক, আজ যে অমানুষিক কাণ্ড স্বচক্ষে দেখে এসেছি, তারপর আর এখানে হাত-পা গুটিয়ে অপেক্ষা করা চলে না। সেই রক্তশূন্য মড়ার মুখ চিরদিন আমার মনে থাকবে! গলার ছাঁদা দিয়ে নিশ্চয় রক্তের ঝরণা করেছিল, কিন্তু সে রক্ত কোথায় গেল? আর, তার গলার ক্ষতটা কি রকম দেখতে জানো মানিক? যেন কোনো রক্তলোলুপ জন্তু ধারালো দাঁত দিয়ে তার গলা কামড়ে ধরেছিল—আর তার দেহের সমস্ত রক্ত সেই-ই প্রাণপণে শুষে পান করে ফেলেছে!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রেতের প্রতিহিংসা

ভোর-বেলায় মোটর ছুটে চলেছে আলিনগর।

জয়ন্ত গাড়ির 'হুইল' ধরে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে বললে, মানিক, মাঠে মাঠে আর পথের মাঝে মাঝে দেখছি এখনো মন্দ জল জমে নেই। আমরা বেলা দুটো-আড়াইটের আগে আলিনগরে গিয়ে পৌছতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।

মানিক বললে, কিন্তু আমরা দু-জনে আলিনগরে গিয়ে কী করব? সেখানে তুমি কী দেখবার আশা করা?

—তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছেঃ গোয়েন্দার কাজ দল বেঁধে চলে না। তাতে শত্রুরা সাবধান হবার সুযোগ পায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রথম দিনেই আমাদের দলে যদি বেশি লোক না থাকত, তাহলে এতক্ষণে সমস্ত রহস্য হয়ত আমরা আবিষ্কার করে ফেলতে পারতুম। তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছেঃ আলিনগরে গিয়ে যে কী দেখব, সেটা আমি নিজেই জানি না। গত পরশু পর্যন্ত এই রহস্য সম্বন্ধে আমার যে-ধারণা ছিল, গেল-কাল সকালে সেই রক্তহীন মৃতদেহ দেখবার পর থেকে সে—ধারণা একেবারে বদলে গেছে। মাঝে মাঝে এখন মনে হচ্ছে, হয়ত সুন্দরবাবুর সন্দেহ ই সত্য, হয়ত এইসব মেয়ে-চুরির মধ্যে আলৌকিক কোনো ব্যাপারই আছে।

মানিক চকিত কণ্ঠে বললে, অলৌকিক বলতে তুমি কী বুঝেছি? ভৌতিক ব্যাপাের?

জয়ন্ত বললে, ভূত বলতে লোকে যা মানে, আমি তা মানি না। ভূতে বেছে বেছে খালি মেয়ে চুরি করবে। কেন? তবে, ভূতে যে মানুষ চুরি করে এমন একটা বিলাতী গল্প আমি পড়েছিলুম। আলিনগর এখনো অনেক দূর। সময় কাটাবার জন্যে তুমি যদি সেই গল্পটা শুনতে চাও, আমি বলতে রাজী আছি। কিন্তু মনে রেখো, এটা গল্প ছাড়া আর কিছু নয়।

মানিক মোটরের একটা কোণ নিয়ে আরাম করে বসে বললে, বল।

জয়ন্ত গাড়ির গতি একবার থামিয়ে, রুপোর শামুকের ভিতর থেকে একটিপ নস্য নিয়ে নাকে গুজে গল্প আরম্ভ করলেঃ

লন্ডন শহরের পথ। শীতার্ত রাত্রি। একখানা বাস ছুটেছে-আজকের মতো এই তার শেষ যাত্রা। বাসের ভিতরে নিচের তলায় লোকজন বেশি নেই।

দোতলায় কেউ উঠেছে বলে কন্ডাক্টরের মনে হল না। তবু একবার নিশ্চিত হবার জন্যে সে বাসের দোতলায় গিয়ে উঠল।

সামনের আসনে একজন আরোহী।

কন্ডাক্টরের বিস্ময়ের সীমা রইল না। এই যাত্রীটি তার চোখকে ফাকি দিয়ে কখন উপরে উঠে বসে পড়েছে?

যাত্রী মাথার টুপিটা মুখের উপরে টেনে নামিয়ে দিয়েছে এবং মাফলার” ও কোটের কলার দিয়ে মুখের নিচের দিকটা ঢেকে ফেলেছে—শীতের হাড়-কঁপানাে হাওয়ার চোট সামলাবার জন্যে। স্থিরভাবে বসে যেন আড়ষ্ট হয়েই সে সামনের দিকে তাকিয়ে ছিল।

বোধহয় সে কন্ডাক্টরের পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছিল। কারণ সে দুই আঙুলে একটি আনি ধরে হাত বাড়িয়ে বসে আছে।

কন্ডাক্টর বললে, ওঃ, ভারি ঠাণ্ডা। রাত মশাই!

যাত্রী জবাব দিলে না।

কোথায় যাবেন?

—ক্যারিক স্ট্রীট।

যাত্রীর উচ্চারণ অদ্ভুত। কন্ডাক্টর আবার শুধোলে, কোথায় বললেন?

—ক্যারিক স্ট্রট-ক্যারিক স্ট্রীট—

—আচ্ছা, আচ্ছা, আমি জানি—অতবার আর বলতে হবে না। বলেই কন্ডাক্টর যাত্রীর হাত থেকে আনিটা টেনে নিলে!

যাত্রী একটুও না ফিরে বললে, জানো? কী জানো তুমি?

কিন্তু কন্ডাক্টরের বুকের ভিতর পর্যন্ত তখন শিউরে শিউরে উঠছে। আনিটা কী অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা! যেন সেটাকে জমাট বরফের ভিতর থেকে টেনে বার করা হয়েছে!

টিকিট কেটে কন্ডাক্টর যাত্রীকে হাত বাড়িয়ে দিতে গেল।

যাত্রী বললে, যেখানে আনি ছিল টিকিটখানা সেইখানে গুজে দাও।

কেন তা সে জানে না, কিন্তু কন্ডাক্টরের ইচ্ছা হল না যে যাত্রীর হাতে হাত দেয়। তার হাতখানা আড়ষ্ট, বোধহয় পক্ষাঘাতে পঙ্গু। টিকিটখানা কোনোরকমে গুজে দিয়ে কন্ডাক্টর বললে, কেমন, পেয়েছেন জগন্নাথমশাই?

তাকে ঠুঁটো জগন্নাথ বলে কৌতুক করা হচ্ছে ভেবেই বোধহয় যাত্রী বললে, তুমি আমার সঙ্গে কথা কয়ো না।

—কে কথা কইতে চায়! বলে কন্ডাক্টর নেমে গেল।

বাস ক্যারিক স্ট্রীটের মোড়ে এসে থামল। কণ্ডাক্টর চাঁচাতে লাগল—ক্যারিক স্ট্রট! ক্যারিক স্ট্রট!

কিন্তু দোতলা থেকে আড়ষ্ট যাত্রী নামবার নাম করলে না।

কন্ডাক্টর আপন মনে বললে, ও যদি সারারাত টঙে বসে থাকতে চায়, থাকুক। আমি আর ওপরে উঠছি না। ...এও হতে পারে, হয়ত কখন সে নেমে গিয়েছে, আমি দেখতে পাইনি।

সেইদিন সন্ধ্যাতেই ক্যারিক সন্ট্রীটের একটি হোটেলের সামনে এসে দাঁড়াল একখানা ট্যাক্সি। ট্যাক্সি থেকে মোটঘাট নিয়ে যে ভদ্রলোকটি নামলেন তার নাম মিঃ রামবোলন্ড। কয়েক বছর আগে তিনি এই হোটেলেই ঘর ভাড়া নিয়ে বাস করতেন। তারপর অস্ট্রেলিয়া গিয়েছিলেন ব্যবসাবাণিজ্য করতে। এতকাল পরে আবার তাঁর পুরানো হোটেলে ফিরে এলেন।

হোটেলের কর্তা তাড়াতাড়ি অভ্যর্থনা করতে এলেন।—এই যে মিঃ রামবোলন্ড! জানি ব্যবসায়ে লক্ষ্মীলাভ করে আবার আপনি আমাদের কাছে ফিরে আসবেন।

মিঃ রামবোল্ড হাসিমুখে বললেন, হ্যাঁ, আমি লক্ষ্মীলাভ করেছি। আমি মস্ত ধনীই বটে।

হোটেলের কর্তা বললেন, কিন্তু তবুও আপনি যে আমাদের মতো গরিবদের ভোলেননি এইটেই যথেষ্ট!

—কী করে ভুলব? এ হোটেল যে আমার নিজের বাড়ির মতো প্রিয়! এখানকার পুরানো চাকর ক্লুটসাম কোথায়। এখানেই কাজ করে? বেশ, বেশ, তাকেই আমি চাই।

রাত্রে মিঃ রামবোল্ড নিজের ঘরে বসে কথা কইছিলেন। ক্লুটসাম জিজ্ঞাসা করছিল, আচ্ছা! হুজুর, অস্ট্রেলিয়া দেশটা কেমন?

—ভালোই।

—সেখানকার আইন বোধহয় এখানকার মতো কড়া নয়?

—কি রকম?

—'ধরুন, আপনি যদি সেখানে কোনো মানুষ খুন করেন, তাহলে পুলিশ আপনাকে ধরে ফাঁসি দেবে তো?

মিঃ রামবোল্ড অত্যন্ত বেশি চমকে উঠলেন। শুকনো গলায় থাতমত খেয়ে বললেন, আমিই বা মানুষ খুন করব কেন, আর আমাকেই বা ফাঁসি দেবে কেন?

—না হুজুর, আমি কথার-কথা বলছি! বাপরে, মানুষ খুন করার কত বিপদ! পুলিশ ফিরবে পাছে পাছে—

রামবোল্ড বাধা দিয়ে জোরে জোরে বললেন, কেন, পুলিশ পাছে পাছে ফিরবে কেন? যদি আমি কারুকে খুন করি, তার লাশ লুকিয়ে ফেলি, কেউ সাক্ষী না থাকে, তাহলে পুলিশ জানতে পারবে কেমন করে?

—কিন্তু হুজুর, যাকে খুন করেছেন সে যদি ভূত হয়? প্রতিশোধ নেবার জন্য আপনাকে খুঁজতে আসে?

রামবোল্ডের মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, থামো থামো!

ক্লুটসাম আশ্চর্য হয়ে বললে, ওকি হুজুর, আপনি অমন করছেন কেন? আমি কথার কথা বলছি।

—আমার গলা শুকিয়ে গেছে! শিগগির এক গেলাস জল আন!

ক্লুটসাম তখনি জল এনে দিলে। রামবোল্ড জলপান করে অন্য কথা পেড়ে বললেন, আচ্ছা! ক্লুটসাম, তোমাদের হোটেল এখন কেমন চলছে?

—খুব ভালো চলছে হুজুর। এই আজকের কথাই ধরুন না! আজ রাত্রে যদি কেউ এসে ডবল টাকাও দিতে চায়, তাহলে তাকে আমরা ঘর দিতে পারব না। হোটেলের কোনো ঘরই খালি নেই।

— ক্লুটসাম, দেখছি আজকের রাত কী ঠাণ্ডা? বাইরে বরফ পড়ছে। আজ কোনো বেচারী যদি এখানে এসে ঘর না পায়, তাহলে তার কষ্টের আর সীমা থাকবে না। আমার তো দুটো ঘর, দুটো বিছানা। আজ যদি সত্যিই কেউ আসে, তাকে তাড়িয়ে দিও না, অন্তত আজকের জন্যে তাকে আমি আমার একটা বিছানা ছেড়ে দিতে রাজী আছি।

—আচ্ছা হুজুর।

মাঝ-রাত্রি। দেউড়ির ঘণ্টাটা হঠাৎ খুব জোরে খুব তাড়াতাড়ি বেজে উঠল—একবার, দুবার, তিনবার।

হোটেলের দ্বারবান অবাক হয়ে ভাবলে, এই তুষার-ঝরা নিশুতি রাতে কে অতিথি বাইরে থেকে এল!

আবার সেইরকম খুব জোর আর তাড়াতাড়ি তিনবার ঘন্টাধ্বনি।

ভিতরে এসে দাঁড়াল এক অদ্ভুত মূর্তি। তার মাথার টুপিটা মুখের উপর টেনে নামানো, আর তার গলার কলারটা টেনে চিবুকের উপর তুলে দেওয়া।

সর্বাঙ্গ ঢাকা মস্ত-বড় ঝলঝলে এক কালো-মিশমিশে ওভার-কোট। ওভার-কোটের একদিকটা ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে—বোধহয় তার হাতে একটা চুপড়ি কিংবা একটা ব্যাগ আছে।

দ্বারবান বললে, সেলাম হুজুর! আপনার কী দরকার?

আগন্তুক কোনো জবাব না দিয়ে এক কোণে একটা টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর বললে, আমি আজকের রাতের জন্যে হোটেলে একখানা ঘর চাই।

—হুজুর, আজ যে হোটেলের সব ঘর ভর্তি হয়ে গেছে!

—তুমি ঠিক জানো?

—হাঁ হুজুর!

—কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখা!

—ভালো করে ভাববার দরকার নেই হুজুর! আমি জানি।

আগন্তুক এতক্ষণে মুখ তুলে দ্বারবানের দিকে দৃষ্টিপাত করলে—তারপর ধীরে ধীরে বললে, আর একবার ভালো করে ভেবে দেখ দেখি।

কেন তা সে জানে না, কিন্তু দ্বারবানের মনে হল, তার দেহের ভিতর থেকে যেন কি-একটা জিনিস—হয়ত তার জীবনই—ঠেলে ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সে ভয়ানক ভয় পেয়ে বলে উঠল, দাঁড়ান হুজুর! আমি জেনে এসে বলছি!

সে হোটেলের ভিতর দিকে চলে গেল। কিন্তু খানিক পরে খবর নিয়ে ফিরে এসে আগন্তুককে আর দেখতে পেল না। কোথায় গেল সে? হোটেলের ভিতরে না বাইরে?

হঠাৎ তার চোখ পড়ল। আগন্তুক যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানটায়। সেখানে মেঝের উপরে লম্বা এক টুকরো বরফ পড়ে চকচক করছে।

তার বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। চারিদিক ঢাকা, তবু এখানে বরফ এল কেমন করে? সেই কনকনে শীতের রাতেও দ্বারবানের কপালের উপর ঘামের ফোটা দেখা দিলে। রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে নিজের মনেই সে বললে, "যাকে এইমাত্র দেখলুম, কে সে? মানুষ?

দোতলার হলঘরে দাঁড়িয়ে ক্লুটসাম দেখলে, সিঁড়ি দিয়ে এক অচেনা ভদ্রলোক নিঃশব্দে উপরে উঠে আসছেন।

এগিয়ে এসে বললে, কে আপনি? কাকে চান?

—তুমি মিঃ রামবোল্ডকে জিজ্ঞাসা করে এস, আজ রাত্রে তীর অন্য বিছানাটা আমি ব্যবহার করতে পারব কি না?

ক্লুটসাম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আগন্তুকের মুখের পানে তাকাল।

মিঃ রামবোল্ডের বাড়তি বিছানার কথা এই অচেনা লোকটি কেমন করে জানতে পারলে? কিন্তু সে কথা নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা না ঘামিয়ে সে আগন্তুকের অনুরোধ রাখবার জন্যে ভিতর দিকে চলে গেল। অল্পক্ষণ পরে ফিরে এসে বললে, "মিঃ রামবোল্ড আপনার নাম জানতে চাইলেন।

আগন্তুক পকেট থেকে বার করলে খবরের কাগজ থেকে কেটে নেওয়া এক টুকরো কাগজ। সেই কাগজের টুকরোটা এগিয়ে দিয়ে সে বললে, "মিঃ রামবোল্ডকে এটা দিয়ে এস। আর তাকে জানিয়ো আমার নাম হচ্ছে, জেমস হাগবার্ড।

ক্লুটসাম সেই কাগজখানা পড়তে পড়তে আবার হোটেলের ভিতর দিকে চলে গেল। তাতে লেখা রয়েছে—

অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরের মিঃ জেমস হাগবার্ড কোথায় অদৃশ্য হয়েছিলেন, এতদিন সে খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। সম্প্রতি একটা জঙ্গলের ভিতর থেকে তঁর মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। বন্দুকের গুলিতে তিনি মারা পড়েছেন। এখন প্রকাশ পেয়েছে, মিঃ রামবোল্ড নামে তার এক বন্ধুকে নিয়ে তিনি ঐ জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন, কিন্তু সেই দিন থেকে মিঃ রামবোল্ডেরও আর কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

একটু পরে ক্লুটসাম আবার ফিরে এল। তারপর তফাতে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে বললে, 'মিঃ রামবোল্ড বললেন—আপনি নরক থেকে এসেছেন, আবার নরকেই বিদায় হোন!'—এই বলেই সে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল। মিনিট পাঁচেক পরেই রামবোল্ডের ঘর থেকে ভেসে এল ঘনঘন বিষম আর্তনাদ ও ভীষণ গর্জন-ধ্বনি।

ক্লুটসাম ঠিক-ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে সেইদিকে ছুটে গেল। কিন্তু ঘরের ভিতরে কোনো জনপ্রাণী নেই।

ঘরে বিছানা, চেয়ার ও টেবিল প্রভৃতি উলটে পালটে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে এবং রক্তের দাগে চারিদিক হয়ে উঠেছে ভয়ানক। এবং ঘরের মাঝখানেই মেঝের উপর পড়ে চকচক করছে ইঞ্চি কয়েক লম্বা এক টুকরো বরফ।

রামবোল্ডের সঙ্গে ক্লুটসামের আর কখনো দেখা হয়নি। কিন্তু সেই রাত্রে হোটেলের সামনের রাস্তায় যে কনস্টেবল পাহারা দিচ্ছিল, সে একটা সন্দেহজনক দৃশ্য দেখেছিল।

কালো ওভার-কেট পরা একটা আড়ষ্ট মূর্তি তুষারাবৃষ্টির মধ্য দিয়ে হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছে এবং তার কাঁধে রয়েছে মস্ত মোটের মতন কি একটা জিনিস।

কনস্টেবল তাকে ধরবার জন্য তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়েছিল, কিন্তু খানিক দূরে গিয়ে আর তাকে দেখতে পায়নি।

মানিক বললে, তাহলে ঘটনাটার অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, মিঃ জেমস হাগবার্ডকে খুন করে মিঃ রামবোল্ড অস্ট্রেলিয়া থেকে পালিয়ে এসেছিলেন। তারপর মিঃ হাগবার্ডের প্রেতাত্মা প্রতিহিংসা নেবার জন্যে বিলাতে এসে মিঃ রামবোল্ডকে হত্যা করে তার দেহ নিয়ে নরকে ফিরে গেল। তুমি কি বলতে চাও, এখানেও মেয়ে-চুরি করেছে ভূতেরা?

জয়ন্ত গাড়ি চালাতে চালাতে গল্প বলছিল। সে মাথা নেড়ে বললে, পাগল! আমি বললুম। গাল-গল্প,-কেবল খানিকটা সময় কাটাবার জন্যে। তার সঙ্গে এখানকার মেয়ে-চুরির কোনোই সম্পর্ক নেই। এখন এ-সব কথা থাক। ঐ দেখ, সামনেই আলিনগরের ভাঙা বাড়িগুলোর এলোমেলো চুড়ো দেখা যাচ্ছে। এদিকে পথেই পড়েছে নদী। গাড়ি নিয়ে আর এগুবার উপায় নেই, এগুবার দরকারও নেই। গাড়িখানাকে একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে এইবারে আমাদের পদব্রজে এগুতে হবে।

মোটর থামিয়ে দু-জনে নামল। তারপর গাড়িখানাকে লুকিয়ে এবং চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে অগ্রসর হলো।

কিন্তু পথ যেখানে নদীর ধারে গিয়ে শেষ হয়েছে, সেইখানে বালির উপরে পাওয়া গেল আবার সেই ছয়জোড়া পায়ের দাগ।

জয়ন্ত হাঁটু গেড়ে বসে খানিকক্ষণ ধরে পায়ের দাগগুলো পরীক্ষা করলে। তারপর মুখ তুলে বললে, মানিক, এবারের পায়ের দাগে বিশেষত্ব আছে। দাগগুলো বড় বেশি গভীর হয়ে বালির ভিতর বসে গেছে। যেন এরা সকলে মিলে কোনো একটা ভারি মোট বহন করে নিয়ে গিয়েছে।

মানিক চমকে উঠে বললে, ভারি মোট! কী হতে পারে সেটা?

—হয়ত কোনো মানুষের—অর্থাৎ স্ত্রীলোকের দেহ! নয় তো অন্য কিছু। সেটা যাই-ই হোক, কিন্তু আমাদের অদৃষ্টের খুব জোর বলতে হবে! এসেই এই দাগগুলো চোখে পড়ে গেল। এ-সূত্র আর ছাড়ছি না, কারণ এই সূত্র ধরেই এবার নিশ্চয়ই সেই ছয় মূর্তিকে আবিষ্কার করব— তারা আর আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না।”

নবম পরিচ্ছেদ

মৃত্যুপুরে

আলিনগরে কোনো বিভীষিকাই তখন সেখানে জেগে নেই। সূর্যকরের সোনার ঢেউ আকাশের নীলিমাকে অম্লান করে তুলেছে। পাখিদের গানের তানের ঢেউ বনের শ্যামলিমাকে উচ্ছসিত করে তুলেছে, নদীর জলের রুপোলি ঢেউ দুই তটের মাটি, বালি আর পাথরকেও সঙ্গীতময় করে তুলেছে। চারিদিকে আলো আর গান, শান্তি আর কান্তি।

তারই মধ্যে অন্ধকারের দুঃস্বপ্ন বহন করে আনছে। কেবল এই ছয়-জোড়া পদচিহ্ন। এই ছয়-জোড়া পায়ের অধিকারী, কে তারা? কেন তারা সর্বদাই একসঙ্গে থাকে, কেন তাদের দলের লোক বাড়েও না কমেও না, কেন তারা একতালে পা ফেলে চলে—আর কেন তারা মেয়ের পর মেয়ে পর মেয়ে চুরি করে? আর, তাদের সঙ্গে নবাবের কোনো সম্পর্ক আছে, কিংবা নেই? আর, আলিনগরে এসে তারা সবাই মিলে কী করে?

জয়ন্ত ও মানিক এই সব কথাই ভাবছিল।

জয়ন্ত বললে, কিন্তু এই ছয়টা মূর্তি যে প্রেতিমূর্তি নয়, এদের দেহ যে ছায়াময় নয়, এরা যে আমাদের মতোই রক্ত-মাংসে গড়া, পা দিয়ে মাটি মাড়িয়ে চলে, এখানকার দাগগুলো সেসত্যও প্রকাশ করেছে। সেদিনের পায়ের দাগগুলোর ভিতর যা লক্ষ্য করেছিলুম আজও তাই লক্ষ্য করছি; এদের মধ্যে

একজন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে, একটা পায়ের গোড়ালি মাটির উপর ফেলতে পারে না। এটাও মনুষ্যত্বের আর একটা লক্ষণ-খোঁড়া ভূতের কথা কখনো শুনেছ?

দু-জনে নদীগর্ভের দিকে নামতে লাগল।

মানিক বললে, দাগগুলো দেখছি নদীর জলের ভিতরে নেমে গেছে। তার মানে, সেই ছয়টা মূর্তি এইখানেই নদী পার হয়েছে।

জয়ন্ত বললে, হ্যাঁ, তাই আমাদেরও এইখানে নেমেই পার হতে হবে। গেল-দুর্যোগে নদীর জল বেড়ে উঠেছে বটে কিন্তু বোধহয় আমাদের কোমরের বেশি উঠবে না। এই সব ছোট ছোট পাহাড়ী নদীর রীতিই এই—এরা যেমন হঠাৎ বড় হয়ে ওঠে, তেমনি হঠাৎ ছোট হয়ে পড়ে; এরা যেন প্রকৃতির আবুহোসেন—আজি বড়, কাল ছাোট। এই আমি দুর্গা বলে নেমে পড়লুম,—যা ভেবেছি তাই, জল খুব কম। এসাো মানিক, কিন্তু দেখাো, বন্দুক রিভলভার আর রসদ যেন জলে ভেজে না।

নদীর ওপারে উঠে একটুও খুঁজতে হলো না, আবার পাওয়া গেল সেই ছয়-জোড়া পায়ের দাগ। নদীর বালির বিছানা যেখানে শেষ হয়েছে। সেখানেও মাটির উপর দিয়ে চলে গিয়েছে। পদচিহ্নের সারি।

মানিক খুশি-গলায় বললে, জয়, সেদিনকার বিষম বৃষ্টি আমাদের ভারি কষ্ট দিয়েছে বটে, কিন্তু আজ আমরা তাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিতে পারি! সেই বৃষ্টিতে ভিজে মাটি খুব নরম ছিল বলেই পায়ের এমন স্পষ্ট আর স্থায়ী ছাঁচ তুলতে পেরেছে।

জয়ন্ত বললে, হ্যাঁ, আর এটাও বোঝা যাচ্ছে, এই ছাঁচগুলো টাটকা, এদের সৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টির পরেই। প্রথম শ্রেণীর পথপ্রদর্শকের মতো এখন এই পায়ের

দাগগুলোও আমাদের নিয়ে যাবে যাদের খুঁজতে এসেছি তাদের ঠিকানায়। হ্যাঁ, ধন্যবাদ দি' বৃষ্টিকে!

পায়ে-হাঁটা মেটে পথ। কোথাও ঝুপসি গাছের তলা দিয়ে, কোথাও কাঁটা-ঝোপ ও জঙ্গলের তলা দিয়ে, কোথাও ভাঙাচোরা বাড়ির ধ্বংসস্তুপ বা টিপিঢপর পাশ দিয়ে অজগরের মতো এঁকেবেঁকে, উঠে নেমে, মোড় ফিরে ফিরে অগ্রসর হয়েছে। পথের উপরে পায়ের দাগগুলো মাঝে মাঝে অস্পষ্ট হয়ে গেছে বটে, কিন্তু একটু পরেই আবার স্পষ্ট হয়ে গিয়ে তারা জয়ন্ত ও মানিককে ভয় দেখাচ্ছে, কিন্তু জমির অন্য প্রান্ত থেকে আবার আত্মপ্রকাশ করছে। পায়ের দাগ তাদের সঙ্গে যেন লুকোচুরি খেলা খেলছে।

জয়ন্ত বললে, মানিক, পৃথিবীর সব দেশেরই গোয়েন্দাগিরির ইতিহাস পড়লে দেখতে পাবে, পায়ের দাগ, রক্তের দাগ, আর আঙুলের ছাপ দেখেই গোয়েন্দারা বেশিরভাগ অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে পেরেছে। আঙুলের ছাপ দেখে অপরাধী ধরবার প্রথা একশো বছর আগেও আবিষ্কৃত হয়নি, কিন্তু পায়ের দাগ আর রক্তের দাগ মানুষের কাজে লেগে আসছে হাজার হাজার বছর আগে থেকেই—মানুষ যখন সভ্যও হয়নি। এই দু-রকম দাগের কোনো-না-কোনোটি দেখে আদিম মানুষ বনে-জঙ্গলে শিকারের খোঁজ পেয়ে জীবন ধারণ করেছে—এখনকার শখের শিকারীদেরও কাছে ঐ দুরকম দাগই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সম্বল। আর পাপীদেরও জব্দ করেছে চিরকাল ঐ দুরকম দাগই। সব পাপীই এই দুরকম দাগকে ভয় করে, কিন্তু তবু এদের কবল থেকে নিস্তার পায় না—যেমন আজও পাবে না। আমাদের হাত থেকে মুক্তি এই ছয়জন মেয়ে-চোর!

মানিক বললে, এরা খালি মেয়ে-চোর নয়, হত্যাকারীও বটে।

জয়ন্ত ভাবতে ভাবতে ধীরে ধীরে বললে, হাঁ। শেষ যে মেয়ে চুরি গেছে, এরা তার মাকে খুন করেছে। কিন্তু মানিক, এখনো এ-রহস্যটা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না যে মৃতদেহের গলায় অত বড় ক্ষতচিহ্ন, কিন্তু তার দেহের রক্ত গেল কোথায়? এক হতে পারে হত্যাকারী দাঁত দিয়ে তার গলায় ছাঁদা করে সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে।—আর যেটুকু রক্ত মাটিতে পড়েছিল তাও জিভ দিয়ে চোটে-পুটে তুলে নিয়েছে; কিন্তু মানুষের পক্ষে এও কি সম্ভব? এই ছয়জন খুনে মেয়ে-চোর যে মানুষ, সে-বিষয়ে তো সন্দেহ করবার উপায় নেই!

হঠাৎ মানিক উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, দেখ জয়, দেখা!

মানিকের দৃষ্টির অনুসরণ করে জয়ন্ত দেখলে, যে-দুখানা মাোটরে চড়ে তারা সেদিন আলিনগরে এসেছিল, তাদেরই ভগ্নাবশেষ। একখানা প্রকাণ্ড ভাঙা বাড়ির স্তূপের উপরে দু-জায়গায় গাড়ি দু-খানা চুরমার হয়ে পড়ে আছে।

জয়ন্ত কৌতুহলী চোখে দেখতে দেখতে পায়ে পায়ে তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তাদের ভিতর থেকে এটা-ওটা-সেটা তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে ফিরে বললে, মানিক, একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ কি?

—কী?

—গাড়ির ভিতরে আমাদের খাবার ছিল। হয়ত ফল বা পাউরুটি প্রভৃতি চারিদিকে ঠিকরে ছড়িয়ে পড়েছিল বলে বনের পশুপক্ষীরা সেগুলোর সদ্ব্যবহার করেছে। কিন্তু গাড়ির ভিতরে ছিল বন্ধ একটিন বিস্কুট আর তিন টিন "জ্যাম" আর চায়ের "ফ্লাস্ক"। সেগুলোর একটা ভাঙা টুকরোও এখানে নজরে পড়ছে না। খাবারের চাঙাড়িরও টুকরো এখানে নেই-তাও কি জন্তুরা খেয়ে ফেলেছে?

মানিক আশ্চর্য হয়ে বললে, তাই তো দেখছি! সত্যি, অতি বড় পেটুক জন্তুও তো টিন বা ধাতু বা ভাঙা চাঙাড়ি হজম করতে রাজী হবে না! সেগুলো গেল কোথায় তবে?

—কোথায় আর? ঐ নবাব, কি ছয়-মুর্তির বাসায়! গাড়ি দুখানাকে ধ্বংসের পথে চালিয়ে দেবার আগে খাবারগুলোকে বাজে নষ্ট হবার সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করা হয়েছে আর কি! মানিক, যারা "স্যাণ্ডউইচ" আর কলা খায়, "জ্যাম" আর বিস্কুটের টিন খোলে, নিশ্চয়ই তারা ভূত নয়। এইসব মেয়ে-চুরি। আর খুনের মূলে আছে তোমার আমার মতো মানুষ-ই।

মানিক বললে, এ প্রমাণটা পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম! চল তবে আবার সেই খুনে মেয়েচোর আর খাবার-চোর মানুষদের পদচিহ্ন অনুসরণ করা যাক।

তারা জনশূন্য আলিনগরের এক প্রান্ত দিয়ে চলেছে। ছোট বড় মাঝারি, বিবর্ণ, সংস্কার অভাবে জীর্ণ কঙ্কালসার বা একেবারে ভাঙা বাড়ির পর বাড়ি যেন নিজেদের দুর্ভাগ্যের ভরে স্তম্ভিত ও স্তব্ধ হয়ে আছে, কিন্তু একদিন তারা অনেক আলোক-মালা দেখেছে, অনেক উৎসবকোলাহল শুনেছে। তাদের ছায়ায় ছায়ায় কত হাসি আর অশ্রুর বিচিত্র অভিনয়ের যবনিকা বারংবার উঠেছে ও পড়েছে, সে হিসাবে যেন তারা আজও ভুলে যায়নি। যেখানে আগে শত শত সঙ্গীতের ও শত শত নূপুরের ধ্বনি জেগে উঠত ক্ষণে ক্ষণে, সেখানে আজ স্তব্ধতার মৃত্যু নিদ্রা ভঙ্গ করেছে। কেবল দেয়ালে দেয়ালে গজিয়ে-ওঠা অশ্বত্থ-বটের শাখায় শাখায় বন্য বাতাসের দীর্ঘশ্বাসের কান্না। যাদের চাতালে চাতালে আগে জীবন্ত ফুলের মতো শিশুরা করতে সুমধুর লীলাখেলা, সেখানে আজ পাথরে পাথরে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে কেবল সাপ, বিছা ও গিরগিটির দল।

মানিক দুঃখিত স্বরে বললে, জয়, আমার পার্সি কবি ওমর খৈয়ামের কবিতা মনে পড়ছে;

‘রাজার বাড়ির থামের সারি আকাশ-ছোঁয়া তুলতো মাথা,
রতন মুকুট পরে হেথায় সোনার তোরণ ধরতো ছাতা।
আজ সেখানে আঁধুল মায়ায় বিজন ছায়া দুলিয়ে দিয়ে,
ঘু-ঘু-ঘু-ঘু-র আকুল স্বরে গাইছে কপোত অশ্রুগাথা।’

জয়ন্ত বললে, এখন মনে হচ্ছে, এই ছয়জন দুরাত্মা বাস করবার ঠিক জায়গাই বেছে নিয়েছে! যারা সমাজের আর মানুষের শত্রু, জ্যান্ত শহরের জনতা তাদের ভালোও লাগবে না, সহ্যও হবে না। তাই এসে আস্তানা গেড়েছে তারা এই মরা শহরে। ভাই মানিক, ঘর-বাড়ির আত্মা থাকে না জানি, কিন্তু এখানকার বাড়ি-ঘরগুলোকে দেখলে প্রেতাত্মার ছবি দেখছি বলেই কি সন্দেহ হয় না?

মানিক বললে, হ্যাঁ, এরা প্রেতাত্মার মতোই ভয়ের ভারে প্রাণ-মন অভিভূত করে দেয়!

জয়ন্ত দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, এই আমরা সেই গোরস্থানের আর একদিকে এসে পড়লুম। এরই মধ্যে সেই ভয়ানক রাতে ছয়টা আলোকে চলাফেরা করতে দেখেছিলুম!

মানিক বললে, পায়ের দাগের রেখা যে এরই মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে!

—তাহলে আমরাও এর মধ্যে ঢুকব। মানিক, বন্দুক প্রস্তুত রাখো, হয়ত এইটেই সেই শয়তানদের আড্ডা। হয়ত এইবারে তারা আমাদের দেখতে পাবে, আর দেখতে পেলে যে জামাইআদর করবে না, সে-বিষয়ে একতিল সন্দেহ নেই।

তারা দু-জনেই সেখানে দাঁড়িয়ে বন্দুকে টোটা ভরে নিলে, নিজের নিজের রিভলভার পরীক্ষা করলে ।

মানিক বললে, কিন্তু অমিয়বাবু আর তাঁর বন্ধুদের মতে, বন্দুকের গুলি বেমালুম হজম করে তারা আক্রমণ করতে পারে।

জয়ন্ত বললে, আমি ও-কথা বিশ্বাস করি না। 'গোলা-খা-ডালা'-র যুগ আর নেই। অমিয়বাবুদের গুলি খেয়েছিল বনের গাছ আর পাহাড়।

তারা চারিদিকে সাবধানে তাকাতে তাকাতে গোরস্থানের ভিতরে প্রবেশকরলে। আলিনগরের কোথাও জীবনের পরিচয় নেই বটে, কিন্তু, এইবারে দেখা দিলে খালি মৃত্যুর চিহ্ন। এখানকার প্রত্যেক উঁচু ঢিপিটাও এক-একটি বিয়োগান্ত জীবন-নাট্যের শেষ নিদর্শন—মানুষের অশান্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার তুচ্ছ পরিণাম? চঞ্চল আলোছায়ার জীবন্ত লীলা বুকের উপরে নিয়ে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে কবরের পর কবরের সার। তাদের তলায় চির-নিদ্রার স্বপ্নহীনতার মধ্যে শুয়ে আছে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে বিতাড়িত কত মানুষের কঙ্কালের পর কঙ্কাল এবং তাদের উপর দলে দলে ফুটে আছে কত আগাছার কত রঙের ফুলের পর ফুল। মানুষের স্মৃতি যাদের ভুলেছে, প্রকৃতির প্রেম তাদের মনে রেখেছে।

দু-ধারের কবরের মাঝখান দিয়ে চলে পদচিহ্নরেখা গোরস্থানের আর-একপ্রান্তে যেখানে গিয়ে শেষ হলো, সেখানেই মস্ত ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে একখানা প্রকাণ্ড অট্টালিকা।

জয়ন্ত ও মানিক তার দিকে তাকিয়ে দেখলে, এই অট্টালিকাও বহুকালের পুরানো বটে, কিন্তু আলিনগরের অন্যান্য বাড়ির মতো এখানা ততটা জীর্ণ ও ভাঙাচোরা নয়। এর অনেকগুলো দরজার কবাট ও জানলার পাল্লা এখনো অটুট আছে এবং এক সময়ে এখানা যে খুব বড় ধনীর বা রাজা-উজিরের প্রাসাদ ছিল, তাও অনুমান করা যায়।

অট্টালিকার প্রবেশ-পথটিও প্রকাণ্ড। হয়ত আগে এখানে জমকালো সাজ-পরা সেপাইসান্ত্রীরা বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে পাহারা দিত, হয়ত আজ তাদেরও কঙ্কাল নিঃসাড় হয়ে আছে ঐ গোরস্থানেরই কোনো বুজে-যাওয়া গর্তে। কিন্তু আজ এই দেউড়ি হয়েছে শেয়াল কুকুরের আনাগোনার রাস্তা।

কিন্তু দেউড়ির সামনেই কী ওটা পড়ে পড়ে পৈতার মতো সরু সরু ধোঁয়া ছাড়ছে?

ধোঁয়া। জনহীনতার রাজ্যে ধোঁয়া? ধোঁয়ার সৃষ্টিকর্তা হচ্ছে অগ্নি। এবং অধিকাংশ অগ্নির সৃষ্টিকর্তা হচ্ছে মানুষ। মানিক আশ্চর্য হয়ে এগিয়ে গেল এবং তাড়াতাড়ি একটা জিনিস তুলে জয়ন্তর চোখের সামনে ধরলে।

জয়ন্ত সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলে, একটা আধ-পোড়া 'কাচি' সিগারেট, তখনো তার আগুন নেবেনি।

দুজনেই বুঝলে, শত্রু একটু আগেই এখানে দিয়ে চলে গিয়েছে এবং খুব কাছেই কোথাও আছে—হয়ত আড়ালে গা ঢেকে তাদেরই গতিবিধি লক্ষ্য করছে।

দুই বন্ধুর সন্দিগ্ধ ও সতর্ক চক্ষু চতুর্দিকে ঘুরতে লাগল—কিন্তু কোথাও কারুর দেখা বা সাড়া পাওয়া গেল না।

মানিক চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, এখন কী করবো?

জয়ন্ত তেমনি স্বরে বললে, বাড়ির ভিতর ঢুকব।

—শত্রু আছে জেনেও?

আমরা তো এখানে বন্ধুদের সঙ্গে খোশ-গল্প করতে আসিনি! যত শীঘ্র শত্রুর দেখা পাওয়া যায় ততই ভালো।

—তা বটে।

বন্দুক দুটো তারা পিঠের উপরে বাঁধলে। তারপর "বেলট" থেকে রিভলভার খুলে হাতে নিয়ে পা টিপে-টিপে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে।

একটা বুক-চাপা ভয়ানক নীরবতায় সেই বিশাল অট্টালিকার ভিতরটা পরিপূর্ণ হয়ে আছে। খানিক দূর এগিয়ে পাওয়া গেল প্রকাণ্ড এক উঠান—তার ভিতরে বোধহয় দুই হাজার লোকের স্থানসঙ্কুলান হয়। উঠানের চারিদিকে সারি সারি থাম ও দালান এবং দালানের পরেই চক-মিলানো ঘর। উঠানের সর্বত্রই বড় বড় ঘাস ও আগাছার ঝোপ। কোথাও জীবনের এতটুকু লক্ষণ নেই—কেবল গাম্ভীর্য গম-গম করছে—সে যেন মৃত্যুপুরীর গম্ভীর্য! দেউড়িতে এইমাত্র সেই জ্বলন্ত সিগারেটটা না দেখলে জয়ন্ত ও মানিক কিছুতেই সন্দেহ করতে পারত না যে, এই নিদ্রিত অট্টালিকার ত্রিসীমানায় বহু বৎসরের মধ্যে কোনো জ্যান্ত মানুষের ছায়া এসে দাঁড়িয়েছে। এখানকার নির্জনতা যেন ভৌতিক,-বুকের রক্ত জমে যায়, গা ছমছম করে, পা এলিয়ে পড়ে। অসহনীয়া!

মানিক ফিস-ফিস করে বললে, 'এই বিশালতার মধ্যে আমরাই হারিয়ে গেছি বলে মনে হচ্ছে! এর মধ্যে কোন দিকে কাকে আমরা খুঁজব ' —তার সেই

অতি মৃদু গলার আওয়াজও সেই নিঃসাড় পুরীর মাঝখানে উচ্চকণ্ঠের গর্জনের মতো শোনালো।

জয়ন্ত আরো খাটো গলায় মানিকের কানে কানে বললে, কিন্তু খুঁজতে হবেই। এস, আগে একতলার সব ঘরেই একবার করে উকি মেরে আসি,- তারপর দোতলা, তারপর তেতলা।

তারা একে-একে প্রত্যেক ঘরে খুব সন্তর্পণে ঢুকে পরিদর্শন আরম্ভ করলে। ঘরে ঘরে বাস করছে যুগ-যুগান্তের ধুলা ও সন্ধ্যার আলো-আঁধারি। একটা ঘরের কোণ থেকে সাপ ফোস করে উঠল। প্রত্যেক ঘরের দরজাই খোলা।

মানিক বললে, এই পোড়ো বাড়ির একতলা ঘরে মানুষ থাকতে পারেনা, মানুষের মন এখানে কুঁকড়ে পড়ে!

জয়ন্ত বললে, কিন্তু আমরা খুঁজছি। সেই সব অমানুষিক মানুষকে, পৃথিবীর সাধারণ মানুষ যাদের ভূতের চেয়ে কম ভয় করে না। ভালোমানুষের প্রাণ যারা মাটির খেলনার মতো ভেঙে ফেলতে পারে, এমন জায়গায় এলে তারা হয়ে ওঠে খুব বেশি খুশি।

নামিয়ে মানিক প্রথমেই ঘরের ভিতরে ঢুকল, এবং তার পরমুহূর্তেই চমকে বাইরে বেরিয়ে এল, তার মুখ একেবারে সাদা।

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে মাথাটা একবার গলিয়ে দিলে।

ধূলিধূসরিত মেঝের উপরে পাশাপাশি শুয়ে আছে ছয়টা মানুষের মূর্তি।

দশম পরিচ্ছেদ

জীবনহারা জীবন্তের দল

যে ছয়টা বিভীষণ মূর্তির জন্যে চতুর্দিকে এমন হুলুস্থুল বেধে গিয়েছে, এই আধা-আলোয় ও আধা-অন্ধকারে তারাই শুয়ে আছে পাশাপাশি ।

কিন্তু ওরা জেগে, কি ঘুমিয়ে? ওরা তাদের সাড়া পেয়েছে, কি পায়নি? আর আমন আদুড় মাটিতে, ধুলো-জঞ্জালেই বা ওরা শুয়ে আছে কেন? ওরা মটকা মেরে পড়ে নেই তো?

অসম্ভব নয়! এই ছয়টা মূর্তির প্রকৃতি যে হিংস্র, প্রথম দিনেই আলিনগরে এসে তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এই ছয় চোরে-চোরে মাসতুতো ভাই যে কত বেশি চালাক, প্রান্তর-সমুদ্রে তারও পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। এদের কাছে জয়ন্তদের দুই-দুইবার পরাজিত হতে—এমনকি প্রায় গালে চুন-কালি মাখতে হয়েছে। তারাই এত সহজে এত অসহায়ভাবে ধরা দিতে রাজী হবে? এদের এই চুপ করে শুয়ে থাকা অত্যন্ত সন্দেহজনক।

জয়ন্ত ও মানিক বাইরে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব ভাবতে লাগল। এক দুই করে ছয়-সাত মিনিট কেটে গেল। এই অসম্ভব নিস্তব্ধতার মুল্লুকে মূর্তিদের কেউ পাশ ফিরলেও তারা সেটা টের পেত, কিন্তু ঘরের ভিতরে কোনো সাড়া নেই—একটা নিঃশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত না। যদি তাদের জন্য কোনোরকম ফাঁদ পাতা হয়ে থাকে, তবে এ কি-রকম ফাঁদ? ওরা ছয়জন, তারা

দুইজন মাত্র; তবু ওরা আক্রমণ করবার জন্যে একটু উসখস পর্যন্ত করছে না কেন?

জয়ন্ত রিভলভার ধরে দরজার পাশ দিয়ে ধরে ধীরে একটুখানি মুখ বাড়িয়ে আবার চট করে দেখে নিলে।

তারা ঠিক তেমনিভাবেই পাশাপাশি শুয়ে আছে। তবে কি সত্যিই তারা ঘুমুচ্ছে? কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ কই? দুষ্টুমি করে তারা কি দম বন্ধ করে আছে? কিন্তু দম বন্ধ করে মানুষ আর কতক্ষণ থাকতে পারে?

আরো মিনিট পাঁচেক পরেও তারা তেমনিভাবেই রইল দেখে জয়ন্তনিজের মুখখানা ভিতরে আরো খানিকটা বাড়িয়ে দিলে। তখনো মূর্তিগুলোর সেই ভাব। শেষটা যা থাকে কপালে ভেবে সে একেবারে ঘরের ভিতরে ঢুকল এবং মানিকও সাহস সঞ্চয় করে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল—

এবং প্রথমেই যা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল তা হচ্ছে এইঃ

একটা মূর্তি ড্যাব-ডাব করে তাদের পানে নিস্পলক চোখ মেলে তাকিয়ে আছে।

জয়ন্তর হৃৎপিণ্ড যেন লাফিয়ে উঠল। মানিক রিভলভারের ঘোড়া টিপে দেয়। আর কি,—কিন্তু জয়ন্ত তার হাত চেপে ধরে মৃদু স্বরে বললে, অন্য মূর্তিগুলোর চোখ দেখ!

কোনো মূর্তির চোখ আধ-খোলা, কোনো মূর্তির চোখ একেবারে মোদা। ... যে মূর্তিটা পুরো চেয়ে আছে, তারও চোখে কোন ভাব নেই।

—জয়! জয়!

—মানিক, এগুলো মড়া!

জয়ন্ত এগিয়ে গিয়ে একে একে মূতিগুলোর বুক হাত দিয়ে দেখলে, শ্বাস-প্রশ্বাসের কোনো লক্ষণ নেই। গা কাঁচের মতো ঠাণ্ডা।

—কিন্তু মানিক, কী করে এরা মরল? কে এদের মারলে?

—জয়, ডানদিকের ঐ মূর্তিটার কপালের উপরে তাকিয়ে দেখ!

জয়ন্ত হেঁট হয়ে দেখে বললে, হুঁ, বুলেটের দাগ। এখনো শুকোয়নি, দাগটাও নতুন নয়।

—তবে কি অমিয়বাবুদের বুলেটের এই কীর্তি?

হাতে পারে। কিন্তু কপালে আমনভাবে গুলি খেয়ে কেউ কি বেঁচে থাকতে পারে? আরে আরে, এই যে! এ মূর্তিটিরও পেটে একটা ছাঁদা—এখানেও বুলেট ঢুকেছে! আর, এটারও পায়ে লেগেছে বন্দুকের গুলি। হাঁ, এই মূর্তিটাই তাহলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটত—পায়ের দাগ দেখেই আমি যা ধরতে পেরেছিলুম। কিন্তু বাছারা, কে তোমরা? বন্দুকের বুলেট খেয়েও তোমরা মরো না—বড়-জোর খুঁড়িয়ে হাঁটো, কিন্তু আজ তোমরা পটল তুলেছ কেন?

—দেখ জয়, যদি ধরে নেওয়া যায় যে ঐ-সব বুলেটই ঐ তিনটে লোকের মৃত্যুর কারণ, তাহলে বাকী তিনটে লোক মরাল কেন? ওদের গায়ে তো দেখছি একটা আঁচড় পর্যন্তও নেই। কিসে ওরা মরেছে? বিষে? কেউ বিষ দিয়েছে, না। ওরা একসঙ্গে আত্মহত্যা করেছে?

—মানিক, এদের কারুর দেহেই বিষের কোনো লক্ষণ নেই। এদের কেউ কোনো উপায়ে হত্যা করেছে বলেও মনে হচ্ছে না। এরা এসে যেন পাশাপাশি শুয়ে পড়ে পরম নিশ্চিন্ত অর শান্তভাবে মৃত্যুঘুমে ঢলে পড়েছে। অথচ এরা যে পরশু রাত পর্যন্ত বেঁচে ছিল সে প্রমাণও রয়েছে—অবশ্য যদি মানা যায় যে পরশু

রাতে এরাই মেয়েচুরি আর খুন করেছিল। এমন বিচিত্র ব্যাপার আমি কখনো কল্পনা করিনি—এমন আশ্চর্য মৃত্যুও কখনো দেখিনি! মানিক, স্বীকার করতে লজ্জা নেই—মনের মাঝে আমি ভয়ের সাড়া পাচ্ছি। ভবতোষ মজুমদারের বজরায় আমরা জ্যান্ত মড়া দেখেছিলুম, কিন্তু সে হচ্ছে ভিন্ন ব্যাপারের, তার মধ্যে ছিল বৈজ্ঞানিক সত্য, কিন্তু এ কী কাণ্ড! বুলেট খেয়ে এরা মরে না, অথচ আজ অকারণেই এখানে এসে মরে পড়ে রয়েছে। মানুষের রক্ত-মাংস বুলেটকে অগ্রাহ্য করে, এটাই বা কী অস্বাভাবিক কথা!

মানিক মূর্তিগুলোর উপরে আর একবার শিউরে-ওঠা চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, জয়,ভালো করে লক্ষ্য করে দেখ, এ মড়াগুলো কি অনেক দিনের পুরানো পচা মড়া বলে মনে হয় না? এই ঘরের ভিতরে কি একটা কবরের ভাব আড়ষ্ট হয়ে নেই? এখানকার বাতাসেও যেন পাঁচা মড়ার দুর্গন্ধ। আমার দেহ কেমন-কেমন করছে, আমার বমন করবার ইচ্ছে হচ্ছে—চল জয়, এই কবরের বিভীষিকার ভিতর থেকে পালিয়ে যাই!

আচম্বিতে দরজার কাছটা অন্ধকার হয়ে গেল। জয়ন্ত ও মানিক চমকে ফিরে দাঁড়াল এবং ঘরের ভিতরে এক পা বাড়িয়ে আবির্ভূত হলো নবাবের সুদীর্ঘ মুর্তি—কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

—মানিক—মানিক!—এস আমার সঙ্গে—বলতে বলতে জয়ন্ত ঘর থেকে তেড়ে বেরিয়ে গেল ঝড়ের মতো।

তারা বাইরে বেরিয়ে দেখলে, নবাব তখন দালানের উপর দিয়ে ছুটছে।

—মানিক, ওকে কিছুতেই আর পালাতে দেওয়া হবেনা, প্রাণ যায় তাও স্বীকার—তবুওকে ধরতেই হবে!

নবাব হঠাৎ বাম দিকে ফিরে আবার অদৃশ্য হলো। জয়ন্ত সেখানে গিয়েই পেলে প্রকাণ্ড এক সিঁড়ি—দুম দাম পায়ের শব্দে বুঝলে নবাব সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছে। তারাও এক-এক লাফ মেরে দুই-তিনটে করে ধাপ পেরিয়ে উপরে উঠতে লাগল।

একেবারে দোতলার দালানে। নবাব আবার এক জায়গায় গিয়ে অদৃশ্য হলো—সঙ্গে সঙ্গে দুম-দুম করে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ।

সেইখানে গিয়ে পড়ে মানিক বললে, এখন উপায়?

—উপায়? মিছেই কি আমি ব্যায়াম করি-ছয়-সাত মণি ওজনের মাল তুলে জুড়ে ফেলে 'দি?

মানিক দরজার উপরে সজোরে পদাঘাত করলে—দরজা একটু কাঁপলও না। হতাশভাবে বললে, এ দরজা ভাঙতে গেলে হাতি আনতে হবে।

—কিছুই আনতে হবে না, আমার মাংসপেশীর জয় হোক —বলেই জয়ন্ত দরজার উপরে পিঠ রেখে দেহের সমস্ত মাংসপেশী ফুলিয়ে রুদ্ধশ্বাসে প্রচণ্ড ধাক্কা মারলে এক-বার, দু-বার, তিন-বার। দাড়াম করে খুলে গেল দরজা-সঙ্গে সঙ্গে টাল সামলাতে না পেরে জয়ন্ত ঘরের ভিতরে পড়ে গেল।

মানিক একলফে জয়ন্তর দেহ টপকে ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখলে, নবাব একটা গরাদ-ভাঙা জানালা দিয়ে গলে বাইরে লাফিয়ে পড়বার চেষ্টা করছে।

মাটির উপরে লম্বমান অবস্থাতেই জয়ন্ত মাথা তুলে চেঁচিয়ে বললে, 'দেহের নিচের দিকে গুলি কর মানিক! লাফ মারলে আর ওকে পাব না।

জয়ন্তরমুখের কথা শেষ হবার আগেই মানিকের রিভলভার গর্জন করে উঠল। বিকট আর্তনাদ করে নবাব জানলা ছেড়ে ঘরের ভিতরে বসে পড়ল।

জয়ন্ত ততক্ষণে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। সে ও মানিক এগিয়ে গিয়ে নবাবের দুই পাশে স্থান গ্রহণ করলে।

জয়ন্ত বললে, মানিক, এর মাথা টিপ করে রিভলভার ধরে থাকে। আমি এর হাতে হাতকড়ি পরিয়ে দি। এ একটু বাধা দিলেই রিভলভার ছুঁড়বে।—জয়ন্ত হাতকড়া বার করলে, নবাব ভালোমানুষের মতো হাত বাড়িয়ে দিলে।

মানিকের রিভলভারের গুলি লেগেছিলো নবাবের উরুর পাশে। সেখান থেকে দরদর ধারে রক্ত করেছে।

তার ক্ষতটা পরীক্ষা করে জয়ন্ত বললে, না, ভয় নেই। এ মারবে না। তারপর নবাব, এইবারে তোমার নবাবির খবর বলো!

তখন দিনের আলো ম্লান হয়ে এসেছে—ঘরের ভিতরে একটু একটু করে আসন্ন রাত্রির আভাস জেগে উঠছে। বাহির থেকে গাছের পাতারা তাদের মর্মর-বার্তা প্রেরণ করছে, তা ছাড়া কোথাও আর কোনো শব্দ নেই।

—কী হলো নবাব, তুমি চুপ করে রইলে কেন?

নবাবের সেই সাপের মতো নির্দয় চক্ষে এতক্ষণ পরে আবার আগুন ফিরে এলো। সে একবার মুখ তুলে জানালা দিয়ে বাইরের রৌদ্রহীন আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলে, তারপর জয়ন্ত ও মানিকের মুখের উপরে চোখ বুলিয়ে সহজ ও শান্ত স্বরেই বললে, তোমরা কী জানতে চাও?

—তুমি মেয়েদের চুরি করে লুকিয়ে রেখেছে?

—জানি না।

—জানো না?

—না।

—এখানে তুমি কী করো?

—জানি না।

—তোমার ঐ ছয় স্যাঙাৎ মরলো কেন?

—জানি না।

—অর্থাৎ তুমি কিছুই বলবে না?

—না।

—"আমি এখনি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে তোমার চিবুকের তলায় ধরবো।—ধীরে ধীরে তোমার দেহের মাংস পোড়াবো।

—পাোড়াও, তবু কিছু বলবো না।

—আচ্ছা, আগে তো তোমায় নিয়ে গিয়ে ফাটকে আটক করি, তারপর তোমার মুখ খোলবার ভালো ব্যবস্থাই করবো।

—'কবার তো সে চেষ্টা করেছিলে। পেরেছিলে কি?

—ও, ভাবছো আবার তুমি পালাবো? বেশ, দেখা যাবে। এখন তো আমার সঙ্গে চলো।

—আমি এখান থেকে যাবো না।

—যাবে না? তোমার ঘাড় যাবে! আমরা তোমাকে লাথি মারতে মারতে নিয়ে যাবো!

নবাবরে দুই চক্ষু দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো। জয়ন্তের দিকে চেয়ে অগ্নিবৃষ্টি করে সে বললে, তুমি আমাকে লাথি মারতে মারতে নিয়ে যাবে? লাথি মারতে মারতে? পারবে না!

—দেখবে, পারি কি না?

নবাব আর জবাব দিলে না। হাঁটু গেড়ে মাটির উপরে বসেছিল। সেই অবস্থায় তার দেহ হঠাৎ সোজা হয়ে উঠলো, তার অগ্নিবর্ষী চক্ষু দুটো মুদিত হয়ে গেলোঁ,—তাকে দেখলেই মনে হয়, ধ্যানমগ্ন নিষ্কম্প এক প্রতিমূর্তি!

মানিক হেসে ফেলে বললে, এ আবার কী নতুন ঢঙ!

জয়ন্ত বললে, জানোই তো প্রবাদ আছে—'দুরাত্মার ছলের অভাব নেই!' কালো আলখাল্লার তলায় কতো কলাকৌশল লুকানো আছে, কে তা জানে? বিড়াল আহ্নিকে বসেছেন, বোধহয় আমাদের প্রশ্ন এড়াবার জন্যে!

কিন্তু সে-সব কথা যে তার কানে ঢুকলো, নবাব তেমন কোনই ভাবের প্রকাশ করলে না। তার সমস্ত বাহ্যজ্ঞান তখন যেন লুপ্ত হয়ে গেছে—কেবল থেকে থেকে তার কপালের উপরের শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠছে। ওদিকে তার আহত উরু দিয়ে রক্ত ঝরে যে কাপড় ও ঘরের ধুলো ভিজিয়ে আরক্ত করে তুলছে, নবাবের সে খেয়াল পর্যন্ত নেই। যন্ত্রণাও তার হচ্ছিলো নিশ্চয়, কিন্তু তার মুখে যন্ত্রণার কোনো চিহ্নই ফুটে ওঠেনি!

মানিক জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। একবার নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলো। জানলার ঠিক তলাতেই রয়েছে বালির স্তূপ। সেইদিকে জয়ন্তর দৃষ্টি আকৃষ্ট করে বললে, জয়, নবাবটা কি রকম ধড়িবাজ দেখা! এখান থেকে বা তিনতলা থেকেও ঐ বালির স্তূপের উপরে লাফিয়ে পড়লে হাত-পা ভাঙবার কোনো ভয়ই নেই। বিপদের সময়ে পালাবার ব্যবস্থা আগে থাকতেই করে রাখা হয়েছে। কিন্তু তবু সে পালাতে পারলে না, তোমার দেহের অদ্ভুত শক্তির জন্যে।

আর তোমার রিভলভারের জন্যে।

—কিন্তু আর কতক্ষণ আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নবাবের ভণ্ডামি দেখবো? আধঘণ্টার মধ্যেই রাতের অন্ধকারে চোখ অন্ধ হয়ে যাবে, নবাবকে এইবার জাগাও!

কিন্তু তাকে আর জাগাতে হলো না, সে নিজেই আবার চোখ খুলে বললে, তোমরা আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চাও? পারবে না।

জয়ন্ত হো-হো করে হেসে বললে, ওহো হো, তুমি বুঝি ধ্যানদৃষ্টিতে নিজের ভবিষ্যৎ দেখে নিয়ে বুঝে ফেললে যে তোমাকে এখান থেকে সরাবার শক্তি আমাদের হবে না?

নবাবও দ্বিগুণ জোরে হা-হা-হা-হা অট্টহাস্যে উচ্ছসিত হয়ে বললে, তোমরা পারবে না— পারবে না! আমাকে এ-ঘরের বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না! জানো, তোমরা কার সঙ্গে লাগতে এসেছে? আমাকে গুলি মেরে জখমই করো আর আমার হাতে হাতকড়িই পরিয়ে দাও, তবু আমি হবো তোমাদের প্রভু! পৃথিবীর কোনো সম্রাটের যে-শক্তি নেই, আমার বুকে আছে সেই বিপুল শক্তি! মানব-দানব-ভূত-প্রেত—আমার আজ্ঞা পালন করবে। সবাই। আমি এই মৃত আলিনগরের একচ্ছত্র সম্রাট, এখানে আমার উপরে আর কারুর আজ্ঞা চলবে না, তোমাদেরও জীবন-মরণ এখন আমারই হাতে। তোমরা আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবে না, পারবে না, পারবে না! হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা—' তার ভীষণ ও অলৌকিক অট্টহাস্য সেই সুবিশাল মৃত্যু-প্রাসাদের মহাস্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে প্রত্যেক খিলানে খিলানে গিয়ে যেন আছড়ে পড়ে ছুটোছুটি করতে লাগলো,- ঘরের ছাদের তলা থেকে শয়তানের অভিশাপের মতোন কালো একঝাক বাদুড় ভয় পেয়ে অন্ধকার দিয়ে বোনা ডানা ঝাঁটুপটু করে জানলা দিয়ে গলে বাইরে

উড়ে গেলো, কোথায় শুয়ে শুয়ে জুতোর কালির চেয়ে কালো একটা বিড়াল বোধহয় ঘুমোচ্ছিল, অট্টহাসির ঘটায় জেগে উঠে দরজার কাছে এসে আগুনচোখে এবার ভিতরে উঁকি মেরে তীক্ষ্ণস্বরে একবার ম্যাও বলে প্রতিবাদ জানিয়েই আবার ছুটে পালালো।

হঠাৎ তার মূর্তির এতো পরিবর্তন হয়েছে যে নবাবের দিকে তাকালেও এখন বুক ধুকপুক করে ওঠে! আচম্বিতে তার এই ভাবান্তরের, এই আস্ফালনের কারণ কী? জয়ন্ত মনের ভিতরে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো; কিন্তু তখনি জোর করে সেই ভাবটা দমন করে সে ধমকে বলে উঠলো, নবাব, তোমার ও বিদঘুটে হাসি থামাও!

নবাব তার দিকে দৃকপাতমাত্র না করে গভীর কণ্ঠে চেঁচিয়ে বললে, ওরে আয়, ওরে আয়, ওরে আয় রে আয় জীবনহারা জীবন্তের দল! সূর্যের চোখ কানা হয়েছে, দিনের আলো নিবে গেছে, বাদুড়ের ঘুম ভেঙেছে, কালো বিড়াল জেগেছে, কবরের দরজা খুলেছে—এইবারে তোরাও উঠে দাঁড়া, গোরস্থানে আলো জ্বাল, নরকের ফটকে সন্ধ্যাবাতি দে! ঝরে পড়ুক তোদের গায়ের ধুলো, জাগুক তোদের বুকে রক্ততৃষ্ণা, দুলুক তোদের গলায় গলায় নরমুণ্ডুমালা! রাত তোদের ডাকছে, শ্মশান তোদের ডাকছে, আমি তোদের ডাকছি! ওরে আয়, ওরে আয় রে। আয় প্রাণহারা মহাপ্রাণীর দল!

জয়ন্ত সক্রোধে মাটির উপরে পদাঘাত করে বললে, মানিক, মানিক, আমরা কি এখানে কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে পাগলের প্রলাপ শুনবো? ঐ বদমাইসটার ঝাঁকড়া চুল ধরে মাটি থেকে টেনে তোলো তো দেখি, ও আমাদের সঙ্গে যায় কিনা?

কিন্তু জয়ন্তের কথা মানিকের কানে ঢুকলো না, সে তখন কান পেতে আর একটা শব্দ শুনছিলো। একতলায় সমতালে পা ফেলে কারা চলছে! ধূপ-ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ! যেন শিক্ষিত সৈন্যদলের পদশব্দ! ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ ধূপ-ধুপ! যেন কাদের পরলোক থেকে ইহলোকে আনাগোনার শব্দ! জয়ন্তেরও মুখ সাদা হয়ে গেলো। তালে তালে সেই পদশব্দ সিড়ির ধাপ দিয়ে উপরে উঠছে।

নবাব আবার ডাক দিলে—ওরে আয়, ওরে আয়, ওরে আয় রে আয় সজীব মৃত্যুর দল!

ধপ-ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ! শব্দ ক্রমেই নিকটস্থ হচ্ছে। মানিক ছুটে দরজার কাছে গেলো। মুখ বাড়িয়ে দেখলে, সিঁড়ি পার হয়ে প্রথমে যে মূর্তিটা আবির্ভূত হলো, তার কপালে সেই বুলেটের দাগ। তার পিছনেই দেখা দিলো আর এক মূর্তি। যেটুকু দেখলে তাই ই যথেষ্ট! খানিক আগে একতলার কোণের ঘরের সেই তাপহীন, শ্বাসহীন, প্রাণহীন আড়ষ্ট দেহগুলোর মধ্যেই মানিক এদের দেখে এসেছে। দ্বিতীয় মূর্তির পিছনে যখন আবার একটা মূর্তি খোঁড়াতে খোঁড়াতে দালানের উপরে এসে উঠলো, মানিক বেগে সেই জানলার কাছে দৌড়ে এসে বললে, জয়, জয়! বাইরে লাফিয়ে পড়ো! সেই মড়াগুলো জ্যান্ত হয়েছে!

নবাব হাঁকলে—ওরে আয়, ওরে আয়, ওরে আয় রে আয় কবরবাসীর দল!

ধুপ-ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ! দরদালান দিয়ে বঁধাতালে পা ফেলে তারা এগিয়ে আসছে, এগিয়ে আসছে, আরও এগিয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি

আসবার জন্যেও তারা কেউ যেন বেতালে পা ফেলবে না,—কিন্তু প্রতি পদক্ষেপেই সেই মৃত্যুচরের দল কাছে—আরো কাছে এগিয়ে আসছে।

জয়ন্ত রুখে দাঁড়িয়ে বললে, আসুক ওরা! আমি ওদের ভয় করি না!

মানিক তাড়াতাড়ি জয়ন্তের হাত ধরে জানালার দিকে তাকে ঠেলে দিয়ে বললে, জয়, দুঃসাহসেরও সীমা আছে! মনে রেখো, বন্দুকের বুলেটও ওদের গতিরোধ করতে পারে না! ঐ ওরা এসে পড়লো! শিগগির লাফ মারো!

নবাব এতক্ষণে উঠে দাঁড়ালো—মুখে তার নিষ্ঠুর হাসি কিন্তু মানিক তৎক্ষণাৎ তার এক পা লক্ষ্য করে আবার রিভলবার ছুড়লে, বিকৃত মুখে নবাব তীব্র চীৎকার করে আবার ভূতলশায়ী হলো।

প্রথমে জয়ন্ত, তারপরে মানিক জানলা গলে নিচেকার বালির স্তূপের উপরে লাফিয়ে পড়লো। তখনো একেবারে অন্ধকার হয়নি। শেষ আলোর শিখরা তখনো আকাশে আধারের সঙ্গে যুদ্ধ করছে।

জয়ন্ত ও মানিক কোনদিকে না তাকিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে নদীর পথে ছুটলো।

ছুটিতে ছুটতে মানিক একবার পেছন ফিরে দেখলে, দোতলার ভাঙা জানলায় মুখ বাড়িয়ে আছে কতকগুলো রক্তশূন্য সাদা মূর্তি।

সে চেঁচিয়ে বলে উঠলো—জয়! আরো জোরে—আরো জোরে ছোটো!

একাদশ পরিচ্ছেদ

মানুষে অমানুষে যুদ্ধের আয়োজন

এদিকে ফাঁড়ির সবাই ভেবেই অস্থির।

সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে সকলে যখন জয়ন্ত ও মানিকের দেখা পেলো না তখন মনে করলে, তারা কোথাও বেড়াতে গিয়েছে, যথাসময়েই ফিরবে।

কিন্তু যথাসময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলো—কোথায় জয়ন্ত আর কোথায় মানিক!

সুন্দরবাবু মত প্রকাশ করলেন, ও দুই ছাকেরাই অত্যন্ত বারফটকা! হুম, এতো যে সাত ঘাটের জল খেয়ে মরিস, তবু কি বেড়াবার শখ মিটলো না? আরে এ পোড়া দেশে দেখবার আছে কী?

একটু বেশি বেলা করেই সেদিন দুপুরের খাওয়া শেষ করা হলো। তবু তাদের দেখা নেই।

বৈকালী চা-পানের সময় এলো।

অমিয় একবার জয়ন্ত ও মানিকের মোটঘাট নাড়াচাড়া করে বললে, জয়ন্তবাবু আর মানিকবাবু অস্ত্রশস্ত্র নিয়েই বেরিয়েছেন দেখছি। তাঁদের রসদের ব্যাগ দুটোও নেই। তবে কি তারা আলিনগরেই গিয়েছেন?

সুন্দরবাবু আঁৎকে উঠে বললেন, অ্যাঁ, বলো কী? সেই যমালয়, যেখানে যমদূতেরা হানা দিয়ে ফিরছে, সেইখানে তারা দুটো প্রাণী গিয়ে কী করতে পারবো?

পরেশ ও নিশীথ বললে, অমিয় বোধহয় ঠিক আন্দাজ করেছে। নইলে এতক্ষণে তাঁরা ফিরে আসতেন।

সুন্দরবাবু হতাশভাবে মাথা নেড়ে বললেন, তাদের ফেরবার আশা ছেড়ে দাও! আর তারা ফিরছে না!—এই বলে তিনি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন, কারুর সঙ্গে আর একটা কথাও কইলেন না।

সন্ধ্যা এলো। রাত হলো। সকলেরই মন খারাপ। মহম্মদ, অমিয়, নিশীথ ও পরেশ টেবিলের ধারে বসে চুপিচুপি পরামর্শ করছেন। সুন্দরবাবু মুড়ি দিয়ে সেইভাবেই পড়ে আছেন।

রাত্রের খাবার সাজিয়ে দেওয়া হলো। অমিয় ডেকে বললে, উঠুন সুন্দরবাবু, খাকেন আসুন।

সুন্দরবাবু বললেন, 'হুম! আমি খাবো না। জয়ন্ত আর মানিক বেঁচে নেই। আমার মন কেমন করছে। আমার গলা দিয়ে খাবার গলবে না।' তীর গলা ধরা ধরা। বোধহয় মুড়ি দিয়ে কাঁদছেন।

মহম্মদ বললেন, আপনি না পুলিশে কাজ করেন! এতো সহজে কাবু হয়ে পড়লেন?

সুন্দরবাবু বললেন, পুলিশে কাজ করি বলে কি আমি মানুষ নই? আমার প্রাণ পাথর? আমি খাবো না।

মহম্মদ বললেন, শুনুন সুন্দরবাবু। পরামর্শ করে ঠিক হলো যে কাল সকালেই আমরা সদলবলে আলিনগরে যাত্রা করবো। সদর থেকে হুকুমও এসেছে। দু-দিন পরেই যেতুম, কিন্তু যেরকম ব্যাপার দেখেছি, আর দেরি করা চলে না।

সুন্দরবাবু উঠে বসলেন, ঠিক বলছেন তো?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু জয়ন্ত আর মানিককে কি পাওয়া যাবে? আলিনগর ভূতের রাজ্য।

—সুন্দরবাবু, ভূত-টুত সব বাজে কথা! কোনো বদমাইস ভূতের ভয় দেখায়। জয়ন্তবাবু বোকা নন-আত্মরক্ষা করতে জানেন।

—হুম! সে বোকা নয় বটে, কিন্তু গোঁয়ার। তাই তার জন্যে ভয় হয়।

—কোনো ভয় নেই। আপনি খেতে বসুন।

—হুম, আচ্ছা! দুটো খাবার মুখে দি' তাহলে। কিন্তু কাল সকালেই যাচ্ছেন তো?

—হ্যাঁ।

—কতো লোক নেবেন?

—আমরা পাঁচজন তো আছিই, আরো জন-বারো চৌকিদারও যাবে।

—জন-বারো? জন-চব্বিশ নেওয়া উচিত!

—তাহলে আরো দু-দিন অপেক্ষা করতে হয়। আপাতত অতো লোক নেই।

—না, না, অপেক্ষা নয়—ঐ জন-বারোতেই হবে।

আহারাদির পর আরো খানিকক্ষণ পরামর্শ চললো। তারপর রাত বারোটা বাজিলো দেখে মহম্মদ উঠে দাঁড়ালেন।

ঠিক সেই সময় ফাঁড়ির দরজায় একখানা মোটর সশব্দে এসে দাঁড়ালো। মহম্মদ বিরক্তস্বরে বললেন, এত রাত্রে কে আবার 'কেস' নিয়ে জ্বালাতে এলো?

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেলো—দুজনের পায়ের শব্দ। সুন্দরবাবু তার বিপুল ভুঁড়ির ভার ভুলে গিয়ে শূন্যে এক লাফ মারলেন। মহা উল্লাসে বলে উঠলেন, ও, পায়ের শব্দ আমি চিনি। জয়ন্ত আর মানিক আসছে!

তারাই বটে। গায়ে, কাপড়-চোপড়ে ধুলো আর কাদা, মাথার চুল উস্কো খুস্কো, কিন্তু মুখে প্রচণ্ড উৎসাহের ঔজ্জ্বল্য।

সুন্দরবাবু একসঙ্গে তাদের দুজনকে চেপে ধরে বললেন, আঃ, বাঁচলুম! কী ভাবনাটাই না হয়েছিলো, হুম!

মহম্মদ বললেন, কোথায় ছিলেন আপনারা। আমরা যে কাল সকালেই আপনাদের খুঁজতে আলিনগরে যাচ্ছিলুম!

জয়ন্ত একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ে বললে, কাল সকালে? না না, নবাবকে যদি ধরতে চান, আজ, এখনি চলুন!

তার মানে?

—নবাবের 'আড্ডা' আমরা আবিষ্কার করেছি, মানিকের দুই গুলিতে তার দুই-পা খোঁড়া হয়ে গেছে, এমনকি নবাবের হাতেও আমরা হাতকড়া পরিয়ে দিয়ে এসেছি।—দেরি করলে সে হয়তো সরে পড়বে।

মহম্মদ বললেন, এতোই যখন করেছেন, তখন দয়া করে নবাবকে ধরে আনলেন না কেন?

—ধরে আনলুম না কেন—বলেই জয়ন্ত থেমে গেলো। তার চোখের সামনে ফুটে উঠলো প্রায়-অন্ধকার গৃহতলে শায়িত সেই ছয়টা মৃতদেহ। নিরালা, নীরব, নির্জন অট্টালিকার ধাপেধাপে সেই ধূপ-ধুপ ধুপ ধুপকরে জ্যাস্তমড়ার

অলৌকিক পদশব্দ আবার ফেন সে শুনতে পেলে স্বকর্ণে থেমে থেমে বললে, মহম্মদ সাহেব, বলতে পারেন, মড়া কখনো বাঁচ?

—মড়া?

—হ্যাঁ, ছক্সটা মড়া আমাদের আক্রমণ করতে এসেছিলো। তাই নবাবকে আনতে পারিনি। পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি।

—কী বলছেন!

—মানিককে জিজ্ঞাসা করুন। আমি খালি পায়ের শব্দ পেয়েছি, মানিক স্বচক্ষে দেখেছে।

অমিয়, নিশীথ ও পরেশ একসঙ্গে বলে উঠলো, আমরাও তাদের দেখেছি।

সুন্দরবাবু বললেন, হুম!! আমার কথাই সত্যি হলো। কাঙালের কথা বাসি হলে টিকে!

মানিক বললে, আপনি কাঙাল নন সুন্দরবাবু, তিনশো টাকা মাইনে পান।

সুন্দরবাবু রেগে বললেন, ঠাট্টা কোরো না মানিক!! এখন ঠাট্টা আমার ভালো লাগছে না।

মহম্মদ মাথা নেড়ে বললেন, এর ভিতরে নিশ্চয় কোন কারসাজি আছে। মড়া আক্রমণ করে? অসম্ভব!

—বেশ তো, এখনি দলবল নিয়ে চলুন না।

—তাও হয় না। যেতে হলে বড়ো বড়ো মোটর চাই। মোটর কাল সকালের আগে পাওয়া যাবে না।

জয়ন্ত নাচারভাবে বললে, তাহলে কাল সকাল পর্যন্তই অপেক্ষা করি, কী আর করবো!

পরিত্যক্ত আলিনগরের প্রাচীন পথ ধরে দুখানা সাধারণ মোটরগাড়ি ও একখানা মোটরবাস অগ্রসর হচ্ছে। জয়ন্ত মানিক ও সুন্দরবাবু ছিলেন একখানা 'টু-সীটারে', জয়ন্ত নিজেই তার চালক। তার পরের গাড়িতে আছেন মহম্মদ, অমিয়, নিশীথ ও পরেশ। 'বাসে' আছে বারজন চৌকিদার, ড্রাইভারদের নিয়ে মোট একুশজন লোক।

জয়ন্তের মতে একুশজন লোকই যথেষ্ট। সুন্দরবাবু খুঁতখুঁত করে বললেন, মোটেই যথেষ্ট নয়! হানাবাড়িতে একশো জন লোকও যথেষ্ট নয়! হুম! একটা ভূত দেখা দিলে একশো জনের একজনেরও আর দেখা পাওয়া যাবে না! আর, এখানে একটা নয়—ভূত আছে।নাকি ছয়-ছয়টা! ব্যাপারে!

মানিক বললে, একজনেরও দেখা পাওয়া যাবে না? তাহলে আপনিও কি পালাবেন?

—পালাবো না তো কি, নিশ্চয় পালাবো। আমি হচ্ছি পুলিশ, আমি ভূতের রোজা নাই; ভূত দেখলে পালাবো না তো কি দাঁড়িয়ে থাকবো?

—তবে আপনি এলেন কেন?

—সেই ছয়টা লোক তো ভূত নাও হতেও পারে? হয়তো তোমাদের ছেলেমানুষ পেয়ে কেউ মিথ্যে ভয় দেখিয়েছে! বিশেষ, এটা দিন-দুপুর। কে না জানে, দিন-দুপুরে ভূত বড়ো একটা দেখা দেয় না।

মানিক মুখ টিপে হেসে বললে, কোন সুন্দরবাবু, আপনি কি প্রাচীন শাস্ত্রবাক্য শোনেননি?

—কী শাস্ত্রবাক্য?

—ঠিক দুপুর-বেলা, ভুতে মারে ঢেলা?

—হুম! আবার ঠাট্টা হচ্ছে?

গাড়িগুলো গোরস্থানে এসে উপস্থিত হলো। জয়ন্ত চেঁচিয়ে বললে, এখানেই সকলকে নামতে হবে।

সকলে একে-একে গাড়ি থেকে নেমে পড়লো। একসঙ্গে এতো লোকের ভিড় হতভাগ্য আলিনগর অনেক কাল দেখেনি। পথের উপরে শুয়ে একটা গোখরো সাপ নিশ্চিন্ত মনে কুণ্ডলী পাকিয়ে রোদ পোয়াচ্ছিলো, সে তাড়াতাড়ি ফোস করে ফণা তুলে উঠেই কালো বিদ্যুতের মতো চিকিতে একখানা পাথরের আড়ালে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলে।

চারিদিকে তাকিয়ে মহম্মদ বললেন, এমন জায়গা কখনো দেখিনি! নগর বললেই লোকের মনে জেগে উঠে জনতার দৃশ্য। কিন্তু জনতাহীন—জলশূন্য সাগর! চারিদিকে খালি ভাঙা বাড়ি আর ঘুঘুর কান্না। দিনের বেলাতেই এখানে বুকের কাছটা ছাৎ-ছাৎ করে ওঠে। এখানে একলা এলে রজ্জুতে সর্পভ্রম হওয়াই স্বাভাবিক!

জয়ন্ত অল্প হেসে বললে, আপনি বোধহয় ভাবছেন, আমরাও রজ্জুতে সর্পভ্রম করেছি? কিন্তু এইটেই আপনার ভ্রম। এই পথে আসুন।

গোরস্থানের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে মহম্মদ বললেন, কিন্তু একটা কিছু গোলমাল আছেই আছে, আপনারা যা দেখেছেন তা ভূতের চেয়েও আশ্চর্য। জ্যান্ত মড়ার কল্পনাও আমি করতে পারছি না!

মানিক বললে, তারা যদি এখানে থাকে, তাহলে আপনিও স্বচক্ষে দেখতে পাবেন।

জয়ন্ত বললে, অনেক সময় বাজে নষ্ট হয়েছে। তারা কি আর এখানে আছে?

সেই বিশাল অট্টালিকার বিবর্ণ উচ্চ চূড়া চতুর্দিকের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে অনেক দূর থেকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সকলে সেই বাড়ির যতো কাছে এগিয়ে যাচ্ছে, সুন্দরবাবু একটু একটু করে ততোই পিছিয়ে পড়ছেন। ক্রমে তিনি চৌকিদারের দলে গিয়ে ভিড়লেন। তাঁর যুক্তি হচ্ছে, পিছিয়ে থাকলে ভুতের আবির্ভাব হলে সর্বাগ্রে তিনিই দৌড় মারতে পারবেন।

মহম্মদ বললেন, "অতো বড়ো বাড়ি ঘেরাও করতে গেলে একশোজন লোকের দরকার।

জয়ন্ত বললে, বাড়ি ঘেরাও করে কোনো লাভ নেই, তখন ভিতরের উঠানে চৌকিদাররা অপেক্ষা করুক। আমরা ডাকলেই তারা যেন ছুটে আসে।

সুন্দরবাবু মনে মনে বললেন, তারাই ছুটে আসবে বটে। ছুটে আসবে, না ছুটে পালাবে? ভূতের সঙ্গে লড়বে এই তালপাতার সেপাইরা। হুম!

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

হুম-হুম-হুম-হুম

সকলে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে। এতগুলো জুতোর শব্দে অট্টালিকাবাসী নির্জনতা যেন চমকে উঠলো সবিস্ময়ে।

জয়ন্ত মনে মনে ভাবলো, নবাব যদি এখনো এখানে থাকে, তাহলে এ পায়ের শব্দগুলো সেও শুনতে পেয়েছে নিশ্চয়ই।

আর সেই জ্যান্ত মড়াগুলো? তারাও কি এখন উৎকর্ণ হয়ে তালে তালে পা ফেলে আক্রমণ করতে আসবার জন্যে অপেক্ষা করছে না?

সুন্দরবাবু মনে মনে ভাবছেন, এবারে তো খাঁচার ভিতরে ইঁদুরের মতো বাড়ির ভিতরে বন্দী হলুম। কোন দিক দিয়ে ভূত এলে কোন দিক দিয়ে পালানো উচিত, কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না। আর চৌকিদারদের সঙ্গে থেকে কোনো লাভ হবে না, এদের হাতে বন্দুক নেই! .তিনি দৌড়ে মহম্মদের সঙ্গ নিলেন।

জয়ন্ত সর্বাগ্রে একতলা দালানের সেই কোণের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। চারিদিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে হতাশভাবে বললে, তারা এখানে নেই।

সুন্দরবাবু আস্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন,—তারা নেই, বাঁচা গেছে। আপদ বিদেয় হয়েছে!

মহম্মদ বললেন, আপনি ঘর ভুল করেননি তো?

জয়ন্ত বললে, না। ঐ দেখুন।' বলেই সে টর্চ টিপে মেঝের উপরে আলো ফেললে। মেঝের উপরে পুরু ধুলো। আর ধুলোর উপরে পাশাপাশি ছয়টা দেহের পরিষ্কার ছাপ।

মানিক বললে, এ-ঘরে মড়াগুলো ছিলো ঠিক মড়ারই মতো। তাদের গায়ে হাত দিয়ে দেখেছি, নাকে হাত দিয়ে দেখেছি।

মহম্মদ খালি বললেন, আশ্চর্য!

সুন্দরবাবু সকলের পিছন থেকে উঁকি মেরে দেহের ছাপগুলো একবার দেখেই শিউরে উঠে বললেন, হুম! আমার নাকে পচা মড়ার গন্ধ আসছে!

মানিক বললে, সত্যি সত্যিই সেদিন এখানে মড়া-পচা গন্ধ ছিলো।

মহম্মদ বললেন, সুন্দরবাবুর ঘ্রাণশক্তি বেশি। আমি কোনো গন্ধ পাচ্ছি না।

জয়ন্ত বললে, চৌকিদারদের উঠানের সব ঘর খুঁজে দেখতে বলুন। ততক্ষণে আমরা উপরটা ঘুরে আসি। কিন্তু বোধহয় মিথ্যা ঘোরাঘুরি। শিকার পালিয়েছে। আমরা যে আবার আসবো নবাব সেটা আন্দাজ করতে পেরেছে। সে বোকা নয়।

দোতলার দালানের কোলে শুয়ে ছিলো সেই কালো বিড়ালটা। লোক দেখেই 'ম্যাও' বলে আপত্তি জানিয়ে ল্যাজ তুলে দৌড় মারলে।

মহম্মদ বললেন, হানাবাড়ির সব লক্ষণই এখানে আছে দেখছি!

মানিক বললে, হ্যাঁ, কেবল কালো বিড়াল নয়, কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে দেখুন, দলে দলে কালো বাদুড়ও ঝুলছে। যেন আধারে তৈরি অতিকায় প্রজাপতি।

—কেবল আসল দ্রষ্টব্যই নেই। ভূত, কি জ্যান্ত মড়া।

সুন্দরবাবু বললেন, ভূত আবার দ্রষ্টব্য কী, না থাকাই তো ভালো।

যে-ঘরে নবাব আহত হয়েছিলো সকলে সেই ঘরে প্রবেশ করলে। ঘরে জনপ্রাণী নেই। মেঝের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে জয়ন্ত খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। যেন নিশ্চল জড় পাথরের মূর্তি। তারপর হঠাৎ কি উৎসাহে তার বিপুল বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠলো। তারপর পকেট থেকে রুপোর শামুক বার করে দু-বার সশব্দে নস্য নিলে।

মানিক জানে, এটা জয়ন্তর বিশেষ আনন্দের লক্ষণ। কিন্তু হঠাৎ সে এমন আনন্দিত হলো কেন?

মহম্মদ বললেন, বাড়ির সব ঘরই যে এমন খালি দেখব, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

জয়ন্ত খুশি-গলায় বললে, সব ঘর হয়ত খালি নেই!

— কী করে জানলেন?

—এখনো ঠিক করে কিছু বলতে পারছি না। আসুন আমার সঙ্গে।

জয়ন্ত অগ্রসর হলো। আর সবাই চলল তার পিছনে পিছনে। সে-ঘর থেকে বেরিয়ে জয়ন্ত খুব ধীরে ধীরে দালান দিয়ে এগুতে লাগল। দালানের পূর্ব প্রান্তে একটা দরজা। সেটা ভিতর থেকে বন্ধ।

মহম্মদ বললেন, এ দরজা বন্ধ করলে কে?

জয়ন্ত বললে, যেই-ই বন্ধ করুক, আমি খুলে দিচ্ছি। আপনাদের বন্দুক তৈরি রাখুন।

তার বিপুল দেহের ধাক্কায় দরজার খিল ভেঙে গেল।

কিন্তু সেটা ঘরের দরজা নয়। অন্দর-মহলের দরজা।

জয়ন্ত আবার অগ্রসর হলো। অন্দরেও একটা উঠান রয়েছে, কিন্তু বাইরের মতো অত বড় নয়। আবার একটা দালান। তারপর আবার একসার সিঁড়ি। জয়ন্ত এবার নিচে নামতে লাগল। তারপর ডানদিকে ফিরে এগিয়ে চলল। সে আবার একটিপ নস্য নিলে, এবং মনের আমোদে শিস দিতে শুরু করলে।

মানিক অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, জয়ন্ত কোথায় যাচ্ছে? এ বাড়ির কিছুই সে চেনে না, এদিকে কখনো আসেও নি, কিন্তু এমন নিশ্চিতভাবে কোথায় যাচ্ছে সে? জয়ন্ত তো অকারণে কিছু করবার পাত্র নয়, কী সূত্র সে পেয়েছে, কখন পেলে এবং কেমন করে পেলে? দ্বিতীয় উঠানের পূর্ব প্রান্তে ঘুটফুটে অন্ধকার একটা ঘর। জয়ন্ত সোজা সেই ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকাল। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একবার টর্চটা জ্বেলে কী যেন দেখলে।

সে ঘরেও কেউ নেই।

মহম্মদ জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে এলেন কেন?

জয়ন্ত সে-কথার জবাব না দিয়ে যেন নিজের মনেই বললে, দেখছি, এ ঘর দিয়ে বেরুবার আর কোনো পথ নেই। তাহলে কোথায় গেল?

—কে কোথায় গেল?

—নবাব। সে এই ঘরেই ঢুকেছে। কিন্তু দরজা দিয়ে আর বেরোয় নি।

মহম্মদ একটু বিরক্ত স্বরেই বললেন, আপনার এমন আশ্চর্য অনুমানের কারণ কী?

—কারণ? রক্তের প্রমাণ মহম্মদ সাহেব, রক্তের প্রমাণ! আপনারা চোখ ব্যবহার করতে শেখেননি কেন?

—আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

—মেঝের দিকে তাকিয়ে দেখুন।

মানিক সবিস্ময়ে দেখলে, গৃহতলে একটা সুদীর্ঘ কালো রেখা। ঘর থেকে মুখ বাড়িয়েও দেখলে, সে রেখা দালান দিয়ে সমান চলে গেছে। রক্ত জমাট বাঁধলে কালো দেখায়। এত বড় একটা সূত্রও তার চোখে পড়েনি বলে সে রীতিমত লজ্জা অনুভব করলে ।

জয়ন্ত বললে, মহম্মদ সাহেব, শুনেছেন তো, মানিকের রিভলবারের গুলিতে কাল নবাবের উরু আর পা জখম হয়েছিল? নবাব যেখান দিয়ে গিয়েছে, কিংবা তাকে যেখান দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সারা পথেই রক্ত ঝরে ঝরে পড়েছে। সেই রক্তরেখা অনুসরণ করেই উপরের ঘর থেকে আমি এখানে এসে হাজির হয়েছি। এখন বুঝতে পারলেন?

সুন্দরবাবু বললেন, হুম! জয়ন্ত, তুমি আমার কান মলে দাও! আমরা কি চোখের মাথা খেয়েছিলুম? এমন সহজ প্রমাণটাও আবিষ্কার করতে পারিনি!

মহম্মদ চমৎকৃত স্বরে বললেন, ধন্য জয়ন্তবাবু, ধন্য! ...কিন্তু সে শয়তানটা গেল কোথায়?

—সেইটেই হচ্ছে সমস্যা। দেখছেন তো, রক্তের একটা রেখাই এই ঘরে এসে ঢুকেছে। নবাব ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে আর একটা রেখাও দেখতে পাওয়া যেত। মহম্মদ সাহেব, আপনি সব চৌকিদারকে এখানে আসতে বলুন, আমি ততক্ষণ নবাবকে পুনরাবিষ্কারের চেষ্টা করি।

মহম্মদ বাইরে গিয়ে বার-তিনেক বাঁশি বাজাতেই চৌকিদারদের দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল।

জয়ন্ত 'টর্চ' জ্বেলে দেখে বললে, মানিক, রক্তের দাগ ঐ দেওয়ালের গায়ে শেষ হয়েছে। কিন্তু দেওয়ালের সামনে গিয়ে নবাব অদৃশ্য হলো কেমন করে, সে তো আর হাওয়া হয়ে মিলিয়ে যেতে পারে না? ...হয়েছে, ঐ দেখ, দেওয়ালের গায়ে দুটো কড়া। এ-সব সেকেলে পুরানো বাড়িতে প্রায়ই গুপ্তদ্বার থাকে। মানিক, কড়া দুটো ধরে জোরে টান মারো তো!

মানিক তাই করলে। খুব সহজেই দেওয়ালের খানিকটা অংশ হড়হড় করে দরজার মতো খুলে গেল। ভিতরে একটা পথ।

জয়ন্ত বললে, সবাই রিভলবার নাও। ছয়জন চৌকিদার গুপ্তদ্বারের সামনে পাহারা দিক। ছয়জন আমাদের সঙ্গে আসুক।

পথটা গিয়ে আর একটা দরজার সামনে শেষ হয়েছে। দরজার সঙ্গে আর একবার জয়ন্তর শক্তিপরীক্ষা শুরু হলো। কিন্তু এ-দরজা জয়ন্তর প্রবল আক্রমণ তিন তিনবার ব্যর্থ করলে।

জয়ন্ত তখন দরজার উপরে পৃষ্ঠদেশ রেখে দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে প্রাণপণে চাপ দিতে লাগল-টর্চ-এর আলোতে দেখা গেল, তার সারা মুখ রাঙা টকটকে হয়ে উঠেছে।

মহম্মদ মাথা নেড়ে বললেন, অসম্ভব চেষ্টা!! মানুষ ও-দরজা গায়ের জোরে ভাঙতে পারে না। অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

হঠাৎ মড়াৎ করে একটা শব্দ হলো। জয়ন্ত সরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, দেখুন, ভেঙেছে কি না?

মহম্মদ এগিয়ে সবিস্ময়ে দেখলেন, দরজার দু-খানা কবাটই চৌকাট থেকে ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। সসম্ভ্রমে জয়ন্তর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, আপনি অসাধারণ মানুষ!

তারপর দু-তিনটে লাথি মারতেই হুড়মুড় করে পাল্লা দু-খানা ভেঙে পড়ল। খোলা দরজা দিয়েই দেখা গেল, একখানা বড় হলঘর এবং ঘরের এদিককার দেওয়ালের সামনে খাটের বিছানার উপরে হাসিমুখে বসে রয়েছে নবাব স্বয়ং!

জয়ন্ত বেঁচিয়ে বললে, সেলাম আলিনগরের সম্রাট! ঘরের ভিতরে যেতে পারি কি?

নবাব খুব মিষ্ট গলায় বললে, এস।

—তোমার সেই জীবনহীন জীবন্তরা কোথায়?

নবাব আবার ঠোটে হাসি মাখিয়ে বললে, বড় হঠাৎ এসে পড়েছ, তাদের জাগাবার আর সময় পেলুম না।

—তাহলে এ-জীবনে আর সময় পাবেও না! —বলেই জয়ন্ত ভিতরে গিয়ে ঢুকল সর্বপ্রথমে। অন্য সবাই তার পিছনে পিছনে এগিয়ে গেল।

হঠাৎ সুন্দরবাবু 'ওরে বাপরে—হুম!' বলে চেঁচিয়ে উঠে সামনে অমিয়কে পেয়েই দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে ঠিক-ঠক করে কাঁপতে লাগলেন।

সকলে ফিরে স্তম্ভিত নেত্রে দেখলে, দরজার দিকের দেওয়ালের তলাতেই পাশাপাশি শুয়ে আছে সেই ছয়টা মূর্তি। তাদের কারুর চোখ মোদা, কারুর চোখ আধা খোলা, কারুর পুরো খোলা। কিন্তু সব চোখই আড়ষ্ট—মড়ার মতো দৃষ্টিহীন!

জয়ন্ত এগিয়ে গিয়ে তাদের বুকে হাত দিয়ে বললে, মহম্মদ সাহেব, দেখে যান—এই ঠাণ্ডা বুকে শ্বাস-প্রশ্বাসের কোনো চিহ্ন আছে কি না!

কিন্তু মহম্মদের রুচি হলো না। দূর থেকেই বললেন, দেখতেই তো পাচ্ছি। ওগুলো মড়া।

মানিক বললে, কিন্তু এই মড়াগুলোই সেদিন বেঁচে উঠেছিল।

মহম্মদ অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন। সুন্দরবাবু চোখ ছানাবড়া করে বললেন, ওরা আবার যদি জাগে? আবার যদি তেড়ে আসে? এই চৌকিদার। লাশগুলো শীগগির এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যা!

কিন্তু চৌকিদাররা কেউ মড়া ছুঁতে রাজী হলো না। নবাব হাসতে হাসতে বললে, ভয় নেই, ওরা কেউ আর জাগবে না। এইবারে আমিও ওদের মতো ঘুমিয়ে পড়ব।

জয়ন্ত চমকে উঠে বললে, ঘুমিয়ে পড়বে—মানে?

—হাঁ, ঘুমিয়ে পড়ব। তোমরা জ্যান্ত নবাবকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবে না। এই দেখ। নবাব বিছানার উপর থেকে একটা খালি শিশি তুলে নিয়ে দেখালে।

—তুমি বিষ খেয়েছ?

—হাঁ। তোমরা হঠাৎ এসে পড়লে, নইলে ওদের আর একবার জাগিয়ে শেষ-চেষ্টা করে দেখতুম। বিষ না খেয়ে উপায় কী?

মহম্মদ বললেন, তুমি সত্যি সত্যিই ঐ মড়াগুলোকে বাঁচাতে পারো?

—পারি। অবিশ্বাস হচ্ছে? দেখবে?

সুন্দরবাবু আঁতকে উঠে তাড়াতাড়ি বললেন, না, না, আর দেখে কাজ নেই! আমার খুব বিশ্বাস হচ্ছে!

নবাব বললে, তোমরা কি পিশাচসিদ্ধ মানুষের কথা শোননি? আমি বহু সাধনায় সেই বিদ্যা অর্জন করেছি। নানান দেশের নানান কবর খুঁজে আমি বেছে বেছে খুব জোয়ান আর টাটকা মড়া তুলে এনেছি। যখন দরকার হয় তখন আমি তাদের নিজের আত্মার অংশ দি'। কিন্তু ওদেরও দেহ তাজা রাখবার জন্যে জ্যান্ত জীবের রক্তের দরকার হয়। তাই যখন ঐ মড়ারা বাঁচে, বনের জীব ধরে তাদের ঘাড় ভেঙে রক্ত খায়, সুবিধা পেলে মানুষের রক্তও পান করে; আর তারপর গোলামের মতো আমার হুকুমে ওঠে বসে চলে ফেরে।...তোমরা কী জানতে চাও বল, আমার ঘুমোবার সময় ঘনিয়ে আসছে।

জয়ন্ত বললে, তুমি মেয়ে চুরি করতে কেন?

হা-হা করে হেসে নবাব বললে, কেন? বলেছি তো, আমি আলিনগরের রাজা। তাই তো আমি নবাব নাম নিয়েছি। আমার বেগম নেই, তাই মেয়ে ধরে আনি বেগম করব বলে। কিন্তু একটা মেয়েও আমার বেগম হবার উপযুক্ত হলো না। তবু তাদের ধরে রেখেছি—মনের মতো বেগম পেলে পর তাদের বাদী করে রাখব বলে।

অমিয় ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠল, কোথায় আমার বোনকে লুকিয়ে রেখেছিস?

পাশের ঘরে গিয়ে দেখগে।

অমিয়, নিশীথ ও পরেশ একসঙ্গে বলে উঠল, কোন দিক দিয়ে যাব?

—ঐ দরজা দিয়ে।

পশ্চিম দিকে একটা দরজা। সেটা ঠেলতেই খুলে গেল, সেদিকেও একটা পথ রয়েছে। তারা তিনজনে ভিতরে ঢুকে চেঁচিয়ে ডাকলে—শীলা, শীলা!

কে ক্ষীণ, কাতর কণ্ঠে সাড়া দিলে, দাদা! দাদা!

মিনিট-তিনেক পরেই অমিয় তার বোনের হাত ধরে ফিরে এল। নিশীথ ও পরেশের পিছনে পিছনে এল আরো তিনটি মেয়ে, সকলেই ভয়ে থারথার করে কাঁপছে।

ছয়টা মৃত মূর্তির দিকে তাকিয়েই শীলা আর্তনাদ করে আতঙ্কগ্রস্ত স্বরে বলে উঠল, দাদা! দাদা! আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল!

অমিয় বললে, আমরা এসে পড়েছি, আর তোর ভয় নেই। শীলা!

শীলা ভয়ে চোখ মুদে শুকনো গলায় বললে, কিন্তু ঐ মড়াগুলো? ওরা যে এখানে রয়েছে। ওরাই যে আমাকে ধরে এনেছে। ওরা যে রোজ আমাকে ভয় দেখায়!

শীলাকে নিজের আরো কাছে টেনে এনে তার পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে অমিয় বললে, ওরা আর কারুকে ভয় দেখাতে পারবে না! ওদের আবার আমরা মাটির তলায় পুঁতে ফেলব।

নবাব গভীর স্বরে বললে, তোমাদের সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে তো? এখন এখান থেকে বেরিয়ে যাও দেখি! আমাকে মরতে দাও।

মহম্মদ বললেন, তা হয় না! তুমি মরবে কি না কে জানে?

নবাব টলে পড়ে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি দেওয়াল ধরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, আমার মৃত্যু নিশ্চিত। তোমরা নির্ভয়ে যেতে পারে।

মহম্মদ মাথা নেড়ে বললেন, চোখের সামনে তোমার মৃত্যু না দেখে আমরা এখান থেকে এক পাও নড়তে পারব না।

নবাবের ঝিমিয়ে-আসা চোখে আবার বিদ্যুৎ খেলে গেল। অস্পষ্ট জড়ানো স্বরে সে গর্জন করে বললে, কী, আমাকে একলা মরতে দেবে না? বটে! হঠাৎ সে সিধে হয়ে উঠল, এবং তার দুই চোখ বন্ধ হয়ে গেল।

মানিক সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললে, ও মরল নাকি?

জয়ন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নবাবের মুখের পানে চেয়ে রইল। আচম্বিতে সুন্দরবাবু মেঝের উপরে প্রচণ্ড এক ঝাপ খেয়ে আছড়ে পড়লেন এবং বেগে গড়াতে গড়াতে নবাবের খাটের তলায় ঢুকে পড়ে ক্রমাগত বলতে লাগলেন, হুম, হুম, হুম হুম!

ওদিকে ঘরের ভিতরে আরম্ভ হয়েছে। চিৎকার ও আর্তনাদের সঙ্গে বিষম হুটোপুটি ও ছুটোছুটি। চৌকিদাররা দল বেঁধে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে গেল অন্য তিনটি মেয়ে—কেবল শীলা তার দাদার দুই বাহুর উপরে এলিয়ে মুর্ছিত হয়ে পড়ল।

সেই ছয়টা মৃতদেহ টলতে টলতে মেঝের উপরে উঠে বসেছে— তাদের প্রত্যেকেরই ভাবহীন চক্ষু একেবারেই বিস্ফারিত।

মহম্মদ পিছনে হটে দেয়ালের উপরে পিঠ রেখে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেলেন। মানিক উপরি-উপরি রিভলবার ছুড়লে, কোনো-কোনো দেহে গুলি ঢুকে বীভৎস ছিদ্রের সৃষ্টি করলে, কিন্তু আশ্চর্য এই যে, একফোঁটাও রক্ত বেরুলো না, কিংবা মূর্তিগুলোর মুখ-চোখে যন্ত্রণার আভাসটুকুও ফুটে উঠল না। কী ভয়ানক! সে অসম্ভব, অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখলেও বুকের রক্ত জমে বরফ হয়ে যায়!

জয়ন্তের হঠাৎ তখন খেয়াল হলো, নবাব নিশ্চয় মরবার আগে শেষবার মড়া জাগাবার জন্যে ধ্যানাসনে বসেছে। সে এক লাফে বিছানার উপর গিয়ে পড়ে নবাবকে প্রচণ্ড ধাক্কা মারলে। নবাব তীব্র কণ্ঠে আঃ বলে শয্যায় এলিয়ে পড়ল।

ওদিকে সেই মুহূর্তেই ছয়টা মূর্তিই উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে আবার অবশ হয়ে প্রথমে বসে—তারপর মাটিতে গড়িয়ে পড়ে গেল। আবার তারা যে মাড়া সেই মড়া।

জয়ন্ত হেঁট হয়ে নবাবের বুকে হাত দিলে। তার বুক স্থির। তার নাকে হাত দিলে। নিশ্বাস পড়ছে না।

মানিক খাটের তলা থেকে সুন্দরবাবুর দেহ টেনে বার করলে। তিনি তখন আর 'হুম' বলছেন না। অজ্ঞান।